গবেষণাপত্র সংকলন-৩

ইসরা ও মি'রাজ
আল হিজাবের মর্মকথা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান
মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

গবেষণাপত্র সংকলন-৩

ইসরা ও মি'রাজ

আল হিজাবের মর্মকথা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন

গবেষণা বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রথম প্রকাশ : রমাদান ১৪২৯
আশ্বিন ১৪১৫
সেপ্টেম্বর ২০০৮

ISBN : 984-843-036-8

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : একশত বিশ টাকা

Gobesonapattra-3 Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition September 2008 Price Taka 120.00 only.

www.amarboi.org

ইসরা ও মি'রাজ

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

www.amarboi.org

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান প্রণীত "ইসরা ও মি'রাজ" শীর্ষক গবেষণাপত্রটির কপি প্রথমে চব্বিশজন ইসলামী চিন্তাবিদের নিকট প্রেরণ করা হয়। অতপর এটি মার্চ ৬, ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত স্টাডি সেশনে উপস্থাপিত হয়। গবেষণাপত্রটির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে এবং মূল্যবান পরামর্শ রেখে বক্তব্য পেশ করেন–

মাওলানা যাইনুল আবেদীন, ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, অধ্যাপক রাফিকুর রাহমান আলমাদানী, মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ খান, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম, ড. আ.জ.ম. কুত্‌বুল ইসলাম নু'মানী, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক ও জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম।

www.amarboi.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসরা ও মি'রাজ

ভূমিকা

মি'রাজ মানব ইতিহাসের এক অনন্য বিশাল ঘটনা। মহান আল্লাহ তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে (সা) দিয়ে তাঁর জীবনের এক যৌক্তিক সময়ে এ বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়ে তাঁকে উত্তমভাবে পুরস্কৃত করেছেন।

হযরত জিব্রাঈল (আ) মহান আল্লাহর দূত হিসেবে বহুবার উর্ধ্বলোক থেকে বিশাল দূরত্বের এ যমীনে যাতায়াত করেছেন কোনো বাহন ছাড়াই। এমনকি এখনো তিনি নির্ধারিত সময়ে যাতায়াত করছেন, যেমনটি সূরা আল কাদরে বলা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ পাকের অসংখ্য ফেরেশতা প্রতি নিয়তই বান্দাহর আমল নিয়ে উর্ধ্বলোকে যাতায়াত করছেন, কিন্তু সেটাকে কোথাও বিস্ময়কর ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়নি। মি'রাজের রাত্রেও হযরত জিব্রাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। কিন্তু শুধু রাসূলুল্লাহর উর্ধ্বলোকে গমনকেই বিস্ময়কর ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিরল ঘটনা মানব ইতিহাসে শুধু একবারই ঘটেছে।

মি'রাজ রজনীতে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে (সা) যা দেখিয়েছেন তা অন্যান্য নবী ও উম্মাত দেখতে পাবেন আরো অসংখ্য বছর পর। যখন কিয়ামাত কায়েম হবে তখন। নিয়ম অনুযায়ী সংবাদ পরিবেশনকারী যতবেশি বিশ্বস্ত হবেন, সংবাদটিও ততবেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়। সকল নবীই পরকালের সংবাদ পরিবেশন করেছেন। কিন্তু কোনো নবী পরকালের চিত্র স্বচক্ষে দেখেননি। এর জন্য মহান আল্লাহ নির্বাচিত করেছেন মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা)-কে।

গ্রহণযোগ্য বর্ণনার ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, মি'রাজের ঘটনাটি ঘটেছিল নবীজীর মাক্কী জীবনের শেষের দিকে, হিজরাতের পূর্বে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাক্কী জীবনের এ সময়টি ছিলো অত্যন্ত কঠিন সময়। মিরাজের মূল ঘটনা বর্ণনার পূর্বে এর প্রেক্ষাপট হিসেবে ঐ সময়ে মক্কাবাসীদের যুলম নির্যাতনের একটি চিত্র আমাদের সামনে থাকা প্রয়োজন।

মি'রাজ বহু পূর্ব থেকেই বহুল আলোচিত একটি ঘটনা এবং সকলের নিকট পরিচিত। এর বিস্তারিত বর্ণনা আল কুরআন ও সহীহ হাদীস এ দু'টো জিনিস সামনে রাখলেই আমরা পেয়ে যাই। এখানে নতুন করে কিছু বলার বা লেখার

www.amarboi.org

নেই। মনে রাখা দরকার যে আল কুরআন ও হাদীসে যা আছে তা-ই আমাদের প্রয়োজন। আর এ দুয়ের বাইরের কিছু আমাদের জন্য নিষ্প্রয়োজন। দুঃখের হলেও একথা সত্য যে, পেশাদার কিছু বক্তা ও বেপরোয়া কিছু লেখক তাদের বক্তৃতা ও লেখার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় অনেক কথা এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার অনেকে অনেক মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস দিয়ে মি'রাজ পর্যালোচনা করেছেন। মনে হচ্ছে এ পর্যায়ে বর্ণিত ছহীহ হাদীসগুলো তাদের বক্তৃতা বা লেখার চাহিদা পূরণ করার জন্যে যথেষ্ট নয়। আবার কেউ মি'রাজের ঘটনাকে পুঁজি করে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মহান আল্লাহর যাতের অংশ হিসেবে প্রমাণ করতে গিয়ে শিরকে লিপ্ত হয়েছে। এসবই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এসব নিয়ে জেনে শুনে চুপ করে বসে থাকা বা কারো অসন্তুষ্টির আশঙ্কায় নীরবতা পালন করা, একজন মুমিনের জন্য কিছুতেই সমীচীন হতে পারে না। যার কারণে আমি এসব বিষয়ে মহানবী (সা)-এর আদর্শকে সামনে রেখে কিছুটা অঙ্গুলি নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। মহান আল্লাহ যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে নেক আমল হিসেবে কবুল করে আখিরাতের আদালতে নাজাতের উছীলা করে দেন এ কামনা করছি।

ইস্‌রা ও মি'রাজ (الاسراء والمعراج) শব্দদ্বয়ের তাহকীক

ইসরা ও মি'রাজ اسراء ومعراج এ দু'টো শব্দ সকল মুসলিমের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। দু'টোই আরবী শব্দ। اسراء শব্দের আভিধানিক অর্থ নৈশ ভ্রমণ করানো। আর معراج শব্দের অর্থ সিঁড়ি বা আরোহণ করার স্থান। عروج শব্দের অর্থ সিঁড়িতে আরোহণ করা বা উর্ধ্বে গমণ করা।

মাসজিদে হারাম থেকে বাইতুল মাকদিছ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভ্রমণ যেমন রাতের বেলায় হয়েছিল, বাইতুল মাকদিছ থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণও একই রাতে হয়েছিল। اسراء শব্দটি "مصدر" আল কুরআনে বর্ণিত "سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ" এর মধ্যে "اسراء" (باب افعال এর) মাছদারের অতীতকালজ্ঞাপক ক্রিয়াপদ বা فعل ماضى এ দৃষ্টিকোণ থেকে "اسراء" শব্দটি এসেছে আল কুরআন থেকে। কিন্তু معراج শব্দটি (এ অর্থে) আল কুরআনে বর্ণিত হয়নি। কারণ বাইতুল মাকদিছে যাত্রা বিরতির পর সেখান থেকে উর্ধ্বলোকে আরোহণের কথা আল কুরআনের কোনো আয়াতে আসেনি। মোদ্দাকথা হল বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নৈশ ভ্রমণের বিষয়ে

www.amarboi.org

আল কুরআনের অকাট্য দলীলটি হলো সূরা اسراء বা সূরা بنى اسرائيل এর ১ম আয়াত :

سُبْحَانَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ -

"মহাপবিত্র মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি আপন বান্দাহকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিক আমি বরকত দিয়ে ভরে রেখেছি। যাতে আমি তাঁকে আমার কুদরাতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন।"

কুরআনুল কারীমের উক্ত আয়াত দ্বারা মহানবী (সা)-এর "اسراء" অর্থাৎ রাতের বেলা রাতের একই অংশের মধ্যে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। বাইতুল মাকদিছ থেকে উর্ধ্বলোকে আরোহণের বিষয়টি মাশহুর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইসলামী আকীদা সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ শরহে আকায়েদে নাসাফিতে উল্লেখ আছে ঃ

"فالاسراء وهو من المسجد الحرام الى بيت المقدس

قطعى ثبت بالكتاب والمعراج من الارض الى السماء مشهور"

অর্থাৎ মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভ্রমণের নাম "ইসরা" যা আল্লাহর কিতাব দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর যমীন থেকে আসমানের দিকে ভ্রমণের নাম "মি'রাজ" যা মাশহুর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[১]

তাফসীরে জালালাইনে উল্লেখ করা হয়েছে :

"فانعم عليه بالاسراء المشتمل على اجتماعه بالانبياء

وعروجه الى السماء ورؤيته عجائب الملكوت مناجاته تعالى"

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী (সা)-কে উত্তমভাবে পুরস্কৃত করেছেন "ইসরা" দিয়ে যার মধ্যে রয়েছে অন্য নবীগণের সাথে একত্রে মিলিত হওয়া, আসমানের দিকে

১. শারহুল আকাইদ আননাসাফী, আল্লামা তাফতাজানী, মি'রাজ অধ্যায়, পৃ. ৩২৭

www.amarboi.org

আরোহণ করা, মালাকুতী জগতের অসংখ্য বিস্ময়কর জিনিস স্বচক্ষে দেখা এবং সর্বোপরি মহান প্রভুর সাথে মুনাজাতে মাশগুল হওয়া।[২]

একদিকে সময়ের নাজুকতা, অপরদিকে মি'রাজের সফলতা

আমরা ভূমিকায় উল্লেখ করেছি যে, "মি'রাজ" রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাক্কী জীবনের শেষের দিকের ঘটনা। হযরত খাদীজা (রা)-এর ওফাত নবুয়াতের দশম বর্ষে হয়েছিলো বলে জানা যায়। তিনি মি'রাজের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আল্লামা ছফিউর রহমান (মোবারকপুরী)[৩] তাঁর অনন্য সীরাত গ্রন্থ "الرحيق المختوم" এ উল্লেখ করেছেন ঃ "ان سياق سورة الاسراء يدل ان الاسراء متأخر جدا" অর্থাৎ (ইখতিলাফ যাই-ই থাকুক না কেন,) সূরা আল ইসরার পটভূমির দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, মি'রাজ মাক্কী জীবনের শেষ প্রান্তের ঘটনা।[৪] এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা একটু পরেই আসবে। ইনশাআল্লাহ।

আল্লামা মোবারকপুরী অবস্থার প্রতিকূলতা এবং এরই মাঝে মি'রাজের সফলতার দিকে ইঙ্গিত করে উল্লেখ করেন ঃ

"وبينا النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه المرحلة التى كانت دعوته تشق فيها طريقًا بين النجاح والاضطهاد، وكانت تترأى نجوما ضئيلة تتلمح فى افاق بعيدة وقع حادث الاسراء والمعراج"

অর্থাৎ একদিকে নবী (সা)-এর দাওয়াতী কাজের সফলতা, আর অন্যদিকে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনের চরম পর্যায় অতিক্রান্ত হচ্ছিল, এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় দূর দিগন্তে মিটমিট করে জ্বলছিলো তারকার মৃদু আলো, এমনি সময়ে মি'রাজের গুরত্বপূর্ণ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।"[৫]

আল কুরআনুল কারীমের সূরা আল বাকারার ২১৪ নং আয়াত থেকে নির্যাতন ও নিষ্পেষণের একটি করুণ চিত্র আমাদের সামনে ভেসে উঠে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

---

২. তাফসীরে জালালাইন, ইমাম মাহাল্লী ও সুয়ূতী, পৃ. ২২৮

৩. আল্লামা শায়খ ছফিউর রহমান মোবারকপুরী হলেন সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি রাবিতায়ে আলমে ইসলামী কর্তৃক আয়োজিত বিশ্বব্যাপী সীরাতুন্নবী প্রতিযোগিতায় ১১৮২ টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী।

৪. আররাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৫৫

৫. আররাহীকুল মাখতুম, শায়খ ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, পৃ. ১৫৫

www.amarboi.org

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ.

'তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখানো তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিপদ মুসীবত আসেনি? তাদের উপর এসেছিল নানা ধরনের বিপদ-মুসিবত। তাদেরকে অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত ঐ সময়কার রাসূল এবং তাঁর অনুসারীগণ আর্তনাদ করে উঠেছিলো যে, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাঁদেরকে এ বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।'

বিরোধিতা

নীরব দাওয়াতের তিনটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসলো "فاصدع بما تومر واعرض عن المشركين" অর্থাৎ হে নবী (সা) আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা আপনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন এবং মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) পৌত্তলিকতার নোংরামি ও অকল্যাণসমূহ প্রকাশ্যে তুলে ধরে মিথ্যার পর্দা উন্মোচিত করেন। তিনি মূর্তিসমূহের অন্তসারশূন্যতা ও মূল্যহীনতা তুলে ধরে তাদের স্বরূপ উদঘাটন করেন। তিনি দৃষ্টান্তসহকারে বুঝাতে থাকেন যে, মূর্তিসমূহ নিরর্থক এবং শক্তিহীন। তিনি আরো জানান যে, যারা এসব মূর্তিপূজা করে এবং নিজের ও আল্লাহর মধ্যে এদেরকে মাধ্যম বানায়, তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

পৌত্তলিক এবং মূর্তির উপাসকদেরকে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে, একথা শোনার পর মক্কার অধিবাসীরা ক্রোধে-ক্ষোভে দিশেহারা হয়ে পড়লো। তাদের উপর যেন বজ্রপাত হলো, তাদের নিরুদ্বেগ শান্তিপূর্ণ জীবনে যেন ঝড়ের তাণ্ডব দেখতে পেলো। এ কারণেই কুরাইশরা অকস্মাৎ উৎসারিত এ বিপ্লবের শিকড় উৎপাটনের জন্যে দিশেহারা হয়ে গেলো। কেননা এ বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের পৌত্তলিক রুসম রেওয়াজ নির্মূল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কুরাইশরা কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়ালো। কারণ, তারা জানতো যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলকে মাবুদ হিসেবে অস্বীকার

www.amarboi.org

করা এবং রিসালাত ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হচ্ছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে রিসালাতের হাতে ন্যস্ত এবং তার কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করা। এতে করে অন্যদের তো প্রশ্নই আসেনা, নিজের জান-মাল সম্পর্কে পর্যন্ত নিজের কোনো স্বাধীন অধিকার থাকে না। এর অর্থ হচ্ছে যে, আরবের লোকদের উপর মক্কার লোকদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব ছিলো, সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এর মানে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ইচ্ছা ও মর্জিই হবে চূড়ান্ত। নিজেদের ইচ্ছামতো আর কিছুই করতে পারবে না। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের উপর তারা যে অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আসছিলো, সকাল-সন্ধ্যা তারা যে ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ছিলো, সেসব থেকে তাদেরকে দূরে থাকতে হবে। কুরাইশরা এর অর্থ ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলো। তাই তাদের দৃষ্টিতে এরূপ অবমাননাকর অবস্থা তারা মেনে নিতে পারছিলো না। কিন্তু এটা কোনো কল্যাণ বা মঙ্গলের প্রত্যাশায় নয় বরং আরো বেশি মন্দ কাজে নিজেদের জড়িত করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। আল্লাহ পাক বলেন بل يريد الانسان ليفجر امامه "বরং মানুষ চায় ভবিষ্যতেও তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হবে।

কুরাইশরা এসব কিছুই বুঝতে পারছিলো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে, তাদের সামনে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। যিনি ছিলেন আদর্শের অনন্য দৃষ্টান্ত। দীর্ঘকাল যাবত মক্কার অধিবাসীরা পূর্ব পুরুষদের মধ্যে এ ধরনের দৃষ্টান্ত দেখেনি বা শোনেনি। এমন এক ব্যক্তিত্বের তারা কিভাবে মুকাবিলা করবে, সেটাও ভেবে দিশা করতে পারছিলো না। তারা ছিলো অবাক ও বিস্মিত। অবশ্য এভাবে বিস্মিত হওয়ার পেছনে কিছু কারণও ছিলো। কুরাইশরা অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, তারা নবী (সা)-এর চাচা আবু তালিবের কাছে যাবে এবং তাকে অনুরোধ করবে যে, তিনিই যেন নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাঁর এ কাজ থেকে বিরত রাখেন।

আবু তালিবের সাথে কুরাইশ প্রতিনিধি দলের সাক্ষাত

ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় একটি প্রতিনিধি দল আবু তালিবের নিকট গিয়ে বললো যে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্যদের গাল-মন্দ করছে, আমাদের ধর্মকে পথভ্রষ্টতা বলছে এবং আমাদেরকে বিবেকহীন বলে অভিহিত করছে। শুধু তাই নয়, আমাদের পিতা ও পিতামহদেরকেও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করছে। কাজেই হয়তো আপনি তাঁকে তাঁর এ তৎপরতা বন্ধ

www.amarboi.org

করতে বলুন অথবা আপনি তাঁর ও আমাদের মাঝখান থেকে সরে দাঁড়ান। কেননা আপনিও আমাদের ধর্মে বিশ্বাসী। তাঁর সাথে বুঝাপড়ার জন্যে আমরাই যথেষ্ট।

এ আবেদনের জবাবে আবু তালিব কিছুটা নমনীয় সুরে কথা বললেন এবং মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করার আশ্বাস দিলেন। তারা ফিরে গেলো। অন্যদিকে রাসূল (সা) সক্রিয়ভাবে দীনের দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখলেন। (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫)

হাজ মওসুমে নবীর (সা) বিরুদ্ধে অপপ্রচার

ঐ সময়ে কুরাইশদের সামনে আরো একটি সমস্যা এসে উপস্থিত হলো। প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে, এমনি সময়ে এসে পড়লো হজ্জের মওসুম। কুরাইশরা জানতো যে, সমগ্র আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিদল এ সময় মক্কায় আসবে। তাই তারা আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলো যাতে আগত প্রতিনিধিদলের প্রতি ইসলামী দাওয়াতের কোন প্রকার প্রভাব না পড়ে। সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে তারা ওয়ালীদ বিন মুগীরার নিকট সমবেত হলো। ওয়ালীদ বললো, সর্বপ্রথম তোমরা একটি পয়েন্টে একমত হতে হবে যে, তোমাদের পরস্পরের কথার মধ্যে যেন কোনো প্রকার গরমিল না হয়। আগত প্রতিনিধিরা বললো যে, আপনিই আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিন, আমরা কি বলবো। ওয়ালীদ বললো, তোমরা প্রস্তাব আকারে বল আমি শুনি। কয়েকজন বললো যে, আমরা বলব তিনি একজন জ্যোতিষী। ওয়ালীদ বললো, না, তিনি জ্যোতিষী নন। আমি জ্যোতিষীদের দেখেছি, তাঁর মধ্যে সে বৈশিষ্ট্য নেই, জ্যোতিষীরা যেভাবে অন্তসারশূন্য কথা বলে থাকে, তিনি সে রকম কথা বলেন না। একথা শুনে প্রতিনিধিরা বললো, তাহলে আমরা বলব যে তিনি একজন পাগল। ওয়ালীদ বলল, না, তিনি পাগলও নন। আমি পাগল দেখেছি। তিনি পাগলের মতো আচরণ করেন না। পাগলের মত উল্টাপাল্টা কথাও তিনি বলেন না। লোকেরা বলল, তাহলে আমরা বলব, তিনি একজন কবি। ওয়ালীদ বললো, তিনি কবিও নন। কবিত্বের বিভিন্ন দিক আমার জানা আছে। তাঁর কথা-বার্তা কবিতা নয়। লোকেরা বলল, তাহলে আমরা বলবো, তিনি একজন যাদুকর। ওয়ালীদ বললো, না, তিনি যাদুকরও নন। আমি যাদুকর এবং যাদুবিদ্যা সম্পর্কে জানি। তাঁর মধ্যে সেটা নেই। লোকেরা বলল, তাহলে আপনিই দয়া করে বলুন আমরা কি বলব? ওয়ালীদ বলল, আল্লাহর শপথ, তাঁর কথা বড় মিষ্টি। তাঁর কথার তাৎপর্য অনেক গভীরতাপূর্ণ। তোমরা যে কথাই

www.amarboi.org

বলবে, শ্রোতারা তা মিথ্যা মনে করবে। তবে তাঁর সম্পর্কে একথা বলতে পারো যে, তিনি একজন দক্ষ যাদুকর। তাঁর কথা শোনার পর পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রী এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। পরিশেষে কাফির প্রতিনিধিদল এ কথার উপরই ঐকমত্য পোষণ করে বিদায় নিল। (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১)

কোন কোন বর্ণনায় বিস্তারিতভাবে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, ওয়ালীদ যখন আগন্তুকদের সব কথা প্রত্যাখ্যান করল তখন তারা বলল, তাহলে আপনিই সুচিন্তিত মতামত পেশ করুন। এটা শুনে ওয়ালীদ বলল, আমাকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য একটুখানি সময় দাও। কিছু সময় চিন্তা-ভাবনা করার পর ওয়ালীদ উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলো। (আততাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র), পারা-২৯, পৃ. ১৮৮)

উল্লেখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ সূরা "المدثر" এর ষোলটি আয়াত অবতীর্ণ করেন। এসব আয়াতে ওয়ালীদের চিন্তা প্রকৃতির চিত্ররূপ লক্ষ্য করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ـ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ـ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ـ ثُمَّ نَظَرَ ـ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ـ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ـ فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلاَّ سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ـ اِنْ هٰذَآ اِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ"ـ

"অর্থাৎ সেতো চিন্তা করলো এবং সিদ্ধান্ত করলো। অভিশপ্ত হোক সে, কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত করলো। আবারো অভিশপ্ত হোক সে, কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। সে আগে চেয়ে দেখলো। অতঃপর সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং মুখ বিকৃত করলো। অতঃপর সে পেছন ফিরলো। দম্ভ প্রকাশ করলো এবং ঘোষণা করলো, এটাতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়, এটাতো মানুষেরই কথা।" (আয়াত ঃ ১৮-২৫)

উল্লেখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিছু সংখ্যক পৌত্তলিক হজ্ব যাত্রীদের আসার বিভিন্ন পথে অবস্থান নেয় এবং রাসূল (সা)-এর ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়। (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ২৭১ পৃ.)

এ কাজে সকলের আগে ছিলো আবু লাহাব। হজ্জের সময়ে সে হজ্জ যাত্রীদের ডেরায়, উকাজ, যুলমাজান্না এবং যুল-মাযাজের বাজারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

www.amarboi.org

পেছনে লেগে থাকে। নবী (সা) দাওয়াতী কাজ করছিলেন এসময় আবু লাহাব পেছন থেকে বলতে থাকে, তোমরা ওর কথা শুনবেনা। সে হচ্ছে মিথ্যাবাদী এবং বেদীন। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯২)

এ ধরনের ছুটাছুটির ফল এ হলো যে, হজ্জ যাত্রীরা জানতে পারলো যে, মুহাম্মাদ (সা) নবুয়াত দাবী করছেন। মোটকথা, হজ্জে আসা লোকদের মাধ্যমে সমগ্র আরব জাহানে আল্লাহর রাসূলের (সা) আলোচনা ছড়িয়ে পড়লো।

রাসূলের বিরোধিতার নানা রূপ

মুসলিমদের মনোবল নষ্ট করার লক্ষ্যে পৌত্তলিকরা নবী (সা)-কে অহেতুক অপবাদ দিতে শুরু করে। কখনো কখনো তারা প্রিয় নবী (সা)-কে পাগল বলতো। যেমন ঃ আল কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে–

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ـ

"তারা (কাফিররা) বলে যার উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে– নিশ্চয়ই তুমি একজন পাগল।" (সূরা আল হিজর ঃ ৬)

কখনো কখনো তাঁর ওপর যাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দেয়া হতো। যেমন আল কুরআন বলছে ঃ

وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ـ

"ওরা আশ্চর্যবোধ করছে যে, ওদের নিকট ওদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছেন এবং কাফিররা বলে, এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী।" (সূরা সোয়াদ ঃ ৪)

কাফিররা আল্লাহর রাসূল (সা)-এর সামনে দিয়ে ও পেছন দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে চলাচল করতো এবং রোষের চোখে তাঁর প্রতি তাকাতো।"

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ـ

"কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আছড়িয়ে ফেলে দেবে এবং বলে এতো পাগল। (সূরা আল কালাম ঃ ৫১) রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোথাও যেতেন এবং তাঁর সামনে পেছনে দুর্বল ও অত্যাচারিত সাহাবায়ে কেরাম থাকতেন, তখন পৌত্তলিকরা ঠাট্টা করে বলতো اهؤلاء من الله عليهم من بيننا অর্থাৎ "আল্লাহ কি আমাদের মধ্য থেকে

www.amarboi.org

তাদের উপর অনুগ্রহ করলেন? (সূরা আল আনআম ঃ ৫৩) তাদের এ উক্তির জবাবে মহান আল্লাহ বলেন ঃ اليس الله باعلم بالشاكرين "আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত নন?" (সূরা আল আনআম ঃ ৫৩)

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ - وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ - وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ - وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ - وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ -

অর্থাৎ "যারা অপরাধী তারা তো মুমিনদের প্রতি উপহাস করতো এবং ওরা যখন মুমিনদের কাছ দিয়ে যেতো, তখন চোখ টিপে টিপে ইশারা করতো এবং যখন ওদের নিজেদের লোকদের মাঝে ফিরে আসতো, তখন ওরা ফিরতো উৎফুল্ল হয়ে এবং যখন ওদেরকে দেখতো, তখন বলতো, এরাতো পথভ্রষ্ট। এদেরকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।" (সূরা আল মুতাফফিফীন ঃ ২৯-৩৩)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষাকে বিকৃত করা, সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করা, মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা করা, দীনের শিক্ষা এবং প্রচারকারীদের ঘৃণ্য সমালোচনা করা ছিল তাদের রুটিনভুক্ত কাজ। এসব কাজ তারা এতো বেশি করতো, যাতে জনসাধারণ আল্লাহর রাসূলের (সা) শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ না পায়। পৌত্তলিকরা কুরআন সম্পর্কে বলতো, আল কুরআনের ভাষায় ঃ

وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً -

অর্থাৎ "ওরা বলছে, এগুলো তো সে কালের উপকথা, যা সে শিখে নিয়েছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়।" (সূরা আল ফুরকান ঃ ৫) কাফিররা আরো বলতো ঃ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ افْتَرٰهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ "এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়। সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।" (সূরা আল ফুরকান ঃ ৪) পৌত্তলিকরা আরো বলতো اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ "তাকে শিক্ষা দেয় একজন মানুষ।" (সূরা আন নাহল ঃ ১০৩)

রাসূল (সা)-কে অস্বীকার করার জন্য কাফিরদের ছুতো ছিল এই যে مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِى الْاَسْوَاقِ - "এই ব্যক্তি কেমন রাসূল, সেতো পানাহার করে এবং (অন্যান্য মানুষের ন্যায়) হাট-বাজারে চলাফেরাও

www.amarboi.org

করে। (সূরা আল ফুরকান ঃ ৭) কাফিরদের একথার মানে হল, তিনি যদি রাসূলই হবেন, তবে তো তিনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন। যিনি সাধারণ মানুষের মতোই পানাহার করবেন, হাট-বাজার করবেন, এমন ব্যক্তি কি করে নবী হতে পারেন? কুরআনুল কারীমের বহু জায়গায় পৌত্তলিকদের অভিযোগসমূহ উল্লেখ করার পর খণ্ডন করা হয়েছে। আবার অনেক জায়গায় অভিযোগগুলো উল্লেখ করা ছাড়াই জবাব দেয়া হয়েছে।

আল কুরআনের প্রভাব ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াস

কাফিরদের অন্যতম নেতা নযর বিন হারিছ একবার কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে বললো ঃ يا معشر قريش والله لقد نزل ... অর্থাৎ হে কুরাইশগণ, আল্লাহর কসম করে বলছি যে, তোমাদের উপর এমন আপদ এসে পড়েছে যে, তোমরা এ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার কোন পথ এখনো উদ্ভাবন করতে পারোনি। মুহাম্মাদ (সা) তোমাদের মাঝেই ছোট থেকে বড় হয়েছেন। তিনি এখন তোমাদের সমাজে সবচেয়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি, সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী, সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত ও আমানতদার। এ অবস্থায় বর্তমানে তিনি বয়সের দিক থেকে একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। তিনি তোমাদের নিকট কিছু কথা নিয়ে এসেছেন। তোমরা তাঁকে বলছো যাদুকর, আল্লাহর শপথ, তিনি মোটেই যাদুকর নন। আমি যাদুকর ও যাদুবিদ্যা–ঝাড়, ফুঁক, গিরা দেয়া ইত্যাদি দেখেছি। তোমরা বলছো, তিনি গণক, আল্লাহর শপথ তিনি গণক নন। আমি গণক ও তাদের কারসাজি দেখেছি। তোমরা বলছো, তিনি কবি, আল্লাহর শপথ, তিনি কবি নন। আমি কবি ও বিভিন্ন প্রকারের কাব্য দেখেছি। তোমরা বলছো, তিনি পাগল। না আল্লাহর শপথ, তিনি পাগলও নন। আমি পাগল দেখেছি, পাগলের পাগলামী দেখেছি, প্রলাপ শুনেছি, তাঁর মধ্যে সেসবের কোন আলামত মাত্রও নেই। সুতরাং হে কুরাইশ! গভীরভাবে চিন্তা কর। তোমাদের উপর নিঃসন্দেহে বিরাট বিপদ এসে পড়েছে।

এরপর নযর হিরায় চলে গেলো এবং সেখানে গিয়ে পূর্বের রাজা-বাদশাহদের বিভিন্ন ঘটনাবলী বিশেষ করে রুস্তম ও ইসফানদিয়ারের কিচ্ছা-কাহিনী শিখলো। এরপর সে মক্কায় ফিরে আসলো। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন মজলিসে বসে আল্লাহর বাণী শুনাতেন, তাঁর শাস্তির কথা লোকদেরকে বলতেন, নযর বিন হারিছ তখন সেখানে গিয়ে লোকদেরকে বলতো, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদের কথা আমার কথার চেয়ে ভাল নয়। এ বলে সে পারস্যের বাদশাহ এবং রুস্তম ও

www.amarboi.org

ইসফানদিয়ারের কাহিনী শোনাতো। এরপর বলতো মুহাম্মাদের কথা কোন্ কারণে আমার কথার চেয়ে ভাল হবে? (ইবনে হিশাম, ১ম খ. পৃ. ২৯৯, ৩০০, ৩৫৮ তাফহীমুল কুরআন ৪/৮, ৯ পৃ. উর্দু সংস্করণ, মুখতাছার সীরাতুর রাসূল, শায়খ আবদুল্লাহ, ১১৭, ১১৮ পৃ.)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নযর বিন হারিছ কয়েকজন দাসী ক্রয় করে রেখেছিলো। যখন সে শুনতো যে, কোন মানুষ নবী (সা)-এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তখন তার ওপর একজন দাসীকে লেলিয়ে দিতো। সে দাসী ঐ লোকটিকে পানাহার করাতো এবং তাকে গান শোনাতো। এক পর্যায়ে ইসলামের প্রতি লোকটির কোনো আকর্ষণ থাকতো না। এই প্রসঙ্গে আল কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয় وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ। "মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা বেহুদা কথাবার্তা ক্রয় করে আল্লাহর রাস্তা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখতে চায়।"

কুরাইশদের আপোষ প্রস্তাব

কুরাইশরা এক পর্যায়ে এসে আরো একটি ব্যর্থ চেষ্টা করলো। তাহলো ইসলাম এবং জাহিলিয়াতের মধ্যে একটি আপোষ বা সমঝোতার প্রস্তাব। এর মানে হলো পরস্পর পরস্পরকে কিছু ছাড় দেয়া। আল্লাহর রাসূল (সা) মুশরিকদের কিছু গ্রহণ করবেন, বিনিময়ে তারাও ইসলামের কিছু গ্রহণ করবে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ "ওরা চায় যে আপনি নমনীয় হবেন, বিনিময়ে ওরাও নমনীয় হবে।" (সূরা আল কালাম ঃ ৯)

ইবনে জারীর ও তাবারানীর এক বর্ণনায় এসেছে যে, একবার মুশরিকরা আল্লাহর রাসূলের (রা) নিকট এসে এই মর্মে প্রস্তাব দিলো যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের উপাসনা করুন, বিনিময়ে আর এক বছর আমরা আপনার প্রভুর উপাসনা করবো। আবদ বিন হুমাইদের একটি বর্ণনায় এসেছে যে, পৌত্তলিকরা বললো, আপনি যদি আমাদের উপাস্যদের মেনে নেন, তাহলে আমরাও আপনার আল্লাহর ইবাদাত করবো। (তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আলা মাওদূদী (র),৬/৫০১, ৫০২ উর্দূ সংস্করণ)

ইবনে ইসহাক সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বা ঘরের

www.amarboi.org

তাওয়াফ করছিলেন, এমতাবস্থায় আল আসওয়াদ বিন মুত্তালিব বিন আসাদ বিন আবদুল ওয্‌যা, ওয়ালিদ বিন মুগীরাহ, উমাইয়া বিন খালাফ এবং আছ বিন ওয়ায়েল আছছাহমী তাঁর নিকট আসলো। ওরা সকলেই ছিলো নিজ নিজ গোত্রের সেরা ব্যক্তি। তারা এসে বললো, এসো হে মুহাম্মাদ, তুমি যাঁর পূজা করছো আমরাও তাঁর পূজা করি। বিনিময়ে আমরা যার পূজা করছি তুমিও তার পূজা করবে। এতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সমতা আসবে। যদি তোমার মাবুদ আমাদের মাবুদের চেয়ে ভালো হয়, তবে আমরা তাঁর কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করবো। আর যদি আমাদের মাবুদ তোমার মাবুদের চেয়ে ভাল হয়, তবে তুমি তার কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারবে। তাদের এই হাস্যকর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ সূরা আল কাফিরুন নাযিল করেন ঃ

قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ - لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ - وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ - وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ - وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ - لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ -

"(হে নবী,) আপনি সুস্পষ্টভাবে বলে দিন, হে কাফিরগণ, তোমরা যার উপাসনা কর আমি কিছুতেই তার উপাসনা করতে পারি না। .... এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ঈমান এবং শিরকের সম্পর্কহীনতার কথা কঠোরভাবে জানিয়ে দিলেন। (ইবনে হিশাম ১ম খ. পৃ. ৩৬২)

এ সিদ্ধান্তমূলক জবাবের মাধ্যমে মুশরিকদের হাস্যকর আপোস প্রস্তাবটি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার সম্ভাব্য কারণ এই যে, এ ধরনের চেষ্টা সম্ভবত মুশরিকদের পক্ষ থেকে একাধিকবার করা হয়েছে।

যুল্‌ম-নির্যাতন

নবুয়াতের চতুর্থ বছরে ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত বন্ধ করতে মুশরিকরা তাদের অপতৎপরতা পর্যায়ক্রমে এবং ধীরে ধীরে চালিয়েছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এমনকি মাসের পর মাস অতিরিক্ত কিছু করেনি এবং যুল্‌ম অত্যাচারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও করেনি। কিন্তু তারা যখন লক্ষ্য করলো যে, তাদের তৎপরতা ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন তারা পুনরায় সমবেত হয়ে পঁচিশজন কাফিরের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করলো। কমিটির সদস্যরা ছিল কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এ কমিটির প্রধান ছিলো রাসূল (সা)-এর আপন চাচা আবু লাহাব। পারস্পরিক সলা-পরামর্শের পর এ কমিটি রাসূলুল্লাহ (সা)

www.amarboi.org

এবং সাহাবীদের বিরুদ্ধে একটি কঠোর সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাব অনুমোদন করলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, ইসলামের বিরোধিতা করতে গিয়ে নবী (সা)-কে কষ্ট দেয়া এবং ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে নির্যাতন করার ব্যাপারে কোনো প্রকার নমনীয়তা দেখানো যাবে না। (রাহমাতুল্লিল আলামীন, ১/৫৯, ৬০)

এ প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর মুশরিকরা তা বাস্তবায়নের জন্যে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলো। দুর্বল ও অসহায় মুসলিমদের বেলায় তাদের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা যদিও সহজ ছিল, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের (সা) বেলায় তা ছিলো খুবই কঠিন। কেননা তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন আদর্শ মানুষ। সকলেই তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতো। তাঁর কাছে সম্মানজনকভাবেই যাওয়া সহজ এবং স্বাভাবিক ছিলো। তাঁর বিরুদ্ধে অবমাননাকর এবং ঘৃণ্য তৎপরতা কেবলমাত্র বর্বর এবং নির্বোধদের জন্যই ছিলো মানানসই। এছাড়াও তিনি ছিলেন আবু তালিবের স্নেহধন্য। আর মক্কায় আবু তালিব ছিলেন অনন্য প্রভাবশালী ব্যক্তি। এহেন পরিস্থিতিতে কুরাইশরা নিদারুণ মর্মপীড়ার মধ্যে দিন যাপন করছিলো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে দীনের প্রচার প্রসার তাদের আধিপত্য এবং পার্থিব নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের শিকড় কেটে দিচ্ছিলো, সে দীনের ব্যাপারে আর কতকাল তারা ধৈর্য ধারণ করবে? পরিশেষে মুশরিকরা আবু লাহাবের নেতৃত্বে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আবু লাহাব তার দুই পুত্র উতবা এবং উতাইবাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুই কন্যা রুকাইয়া এবং উম্মু কুলসুমের সাথে বিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু রাসূলের (সা) নবুয়াত প্রাপ্তির পর দীনের দাওয়াতী প্রচারণার শুরুতে আবু লাহাব রাসূলের (সা) কন্যাদ্বয়কে তালাক দিতে তার দুই পুত্রকে বাধ্য করে। (তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন, সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) ৩০/২৮২, তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী (র), ৬/৫২২, উর্দূ সংস্করণ)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দ্বিতীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর আবু লাহাব এতো খুশি হয়েছিলো যে, সে তার বন্ধুমহলের নিকট ছুটে গিয়ে যারপর নাই খুশির সাথে বলছিলো যে, মুহাম্মাদ পুত্রহারা হয়ে গেছে। তাফহীমুল কুরআন, ৬/৪৯০, উর্দূ সংস্করণ)

হজ্জের মওসুমে আবু লাহাব নবী (সা)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য তাঁর পেছনে বাজার এবং বিভিন্ন সমাবেশে লেগে থাকতো। তারিক বিন আবদুল্লাহ আলমুহারিবীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা

www.amarboi.org

মিথ্যা প্রমাণ করার অপচেষ্টাতেই শুধু ব্যস্ত থাকতো না বরং তাঁকে লক্ষ্য করে পাথরও নিক্ষেপ করতো। এতে তাঁর পায়ের গোড়ালি থেকে রক্ত ঝরতে দেখা যেতো। (জামে আততিরমিযী)

আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মু জামীল (তার আসল নাম ছিলো আরওয়া বিনতে হারব বিন উমাইয়া, সে ছিলো আবু সুফিয়ানের বোন) নবী (সা)-এর প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে আবু লাহাবের চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে ছিলো না। রাসূলুল্লাহ (সা) যে পথে চলাফেরা করতেন, ঐ পথে এবং তাঁর দরজায় সে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো। (উল্লেখ্য যে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু লাহাবের পাশাপাশি ঘর ছিলো)। অত্যন্ত অশ্লীল ভাষী এবং ঝগড়াটে ছিলো এ মহিলা। নবী (সা)-কে গালমন্দ করা, কুটনামি, নানা ছুঁতোয় ঝগড়া, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস চালানো ছিলো তার নিত্ত নৈমিত্তিক কাজ। আল কুরআন তাকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ "ইন্ধন বহন কারিনী" বলে আখ্যায়িত করে।

যখন উক্ত মহিলা জানতে পারলো যে, তার এবং তার স্বামীর নিন্দা করে আল কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খুঁজতে খুঁজতে বাইতুল্লাহ শরীফের নিকট আসলো। তিনি তখন কা'বার পাশে বসা ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা)। ঐ মহিলার হাতে ছিলো এক মুষ্টি পাথর। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছাকাছি গিয়ে পৌছলে মহান আল্লাহ রাসূলের (সা) ওপর থেকে তার দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেন। সে রাসূলকে (সা) দেখতে পায়নি। অবশ্য হযরত আবু বাকরকে দেখেছিলো। সে হযরত আবু বাকরের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলো যে, তোমার সাথী কোথায়? আমি জানতে পেরেছি সে নাকি আমার নামে নিন্দাবাদ করছে। আল্লাহর শপথ, যদি আমি তাকে পেয়ে যাই, তবে তার মুখে এ পাথর ছুঁড়ে মারবো। দেখ, আল্লাহর শপথ, আমিও একজন কবি। এ বলে সে নিম্নের কবিতাগুলো বললো ঃ

مذمما عصينا – وامره ابينا – ودينه قلينا

অর্থাৎ– 'মুজাম্মামের অবাধ্যতা করছি, তার কাজকে সমর্থন করি না এবং তার দীনকে ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করছি।' এ বলে সে চলে গেল। (উল্লেখ্য যে, মুশরিকরা নবী (সা)-এর নাম মুহাম্মাদের স্থলে "মুযাম্মাম বলতো"। কারণ মুহাম্মাদ অর্থ প্রশংসিত। আর مذمم মুযাম্মাম শব্দের অর্থ হচ্ছে নিন্দিত)। হযরত আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? তিনি বললেন, না দেখতে পায়নি।

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ আমার ওপর থেকে তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১/৩৩৫, ৩৩৬)

আরো কিছু প্রতিবেশী আল্লাহর রাসূল (সা)-কে কষ্ট দিতো। আল্লামা ইবনে ইসহাক বলেন, যেসব প্রতিবেশী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কষ্ট দিতো তাদের নাম হলো ঃ (১) আবু লাহাব (২) হাকাম বিন আবুল আছ বিন উমাইয়া (৩) উকবা বিন আবু মুয়াঈত (৪) আদী বিন হামরা আছছাকাফী, (৫) এবং বিন আছদা আল হুজালী প্রমুখ। এদের মধ্যে হাকাম বিন আবুল আছ ব্যতীত কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। এদের কষ্ট দেয়ার পদ্ধতি ছিল এরকম, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামায আদায় করতেন তখন এদের কেউ ছাগলের নাড়িভুড়ি এমনভাবে ছুঁড়ে মারতো যে সেসব গিয়ে তাঁর গায়ে পড়তো। আবার রান্না করার সময় চুলার উপর হাড়ি বসানো হলে বকরির নাড়িভুড়ি হাড়ি লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করতো। এসব নাড়িভুড়ি নিক্ষেপের পর রাসূলুল্লাহ (সা) সেগুলো একটি কাঠির মাথায় তুলে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন, হে বনী আবদে মান্নাফ, এটা কেমন ধরনের প্রতিবেশী সুলভ ব্যবহার? এরপর তিনি সেসব বাইরে ফেলে দিতেন। (ইবনে হিশাম, ১/৪১৬)

উকবা বিন আবু মুয়াঈত ছিলো জঘন্যতম দুর্বৃত্ত। দুষ্কৃতি ও নোংরামিতে সে ছিলো শীর্ষস্থানে। সহীহ আল বুখারীতে হাদিসের বর্ণনায় এসেছে ঃ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) কা'বা ঘরের পাশে নামায আদায় করছিলেন। আবু জাহল এবং তার কতিপয় বন্ধু সেখানে বসেছিলো। এসময় একজন অন্যজনকে বললো, কে আছ অমুকের উটের নাড়িভুড়ি এনে মুহাম্মাদ যখন সিজদায় যাবে তখন তার পৃষ্ঠে চেপে দিতে পারবে? সবচেয়ে বদবখত ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো (তার নাম উকবা বিন আবু মুয়াঈত)। সে উটের নাড়িভুড়ি এনে অপেক্ষা করতে লাগলো। নবী (সা) সিজদায় যাওয়ার পর সেই নাড়িভুড়ি তাঁর উভয় কাঁধের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিলো। বর্ণনাকারী বলছেন, আমি সবকিছু দেখছিলাম। কিন্তু কিছু করার ক্ষমতা ছিলো না। আমার যদি বাধা দেয়ার শক্তি থাকতো কত ভালো হতো। এর পর হাসি-ঠাট্টা করতে করতে একজন অন্য জনের গায়ে ঢলে পড়ছিলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) সিজদায় পড়ে থাকলেন, মাথা উঠাতে পারছিলেন না। হযরত ফাতিমা (রা) জানতে পেরে ছুটে এসে নাড়িভুড়ি সরিয়ে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) মাথা উঠালেন এবং বদদু'আ করতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ, কুরাইশদের দায়িত্ব আপনার উপর। এই বদদু'আ শুনে তারা অসন্তুষ্ট হলো। কারণ তারা জানতো যে, এ শহরে দু'আ কবুল হয়ে থাকে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) নাম ধরে ধরে বদদু'আ করলেন ঃ 'হে

www.amarboi.org

আল্লাহ, আবু জাহলকে পাকড়াও করুন, উতবা বিন রাবিয়া, শাইবা বিন রাবীয়া, ওয়ালীদ বিন উতবা, উমাইয়া বিন খালাফ এবং উকবা বিন আবু মুয়াঈতকেও পাকড়াও করুন।' বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ৭ম বারে এক ব্যক্তির নাম বলেছিলেন, কিন্তু তা স্মরণ রাখতে পারিনি। বর্ণনাকারী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব কাফিরের নাম ধরে বদদু'আ করেছিলেন আমি দেখেছি বদরের কুয়োয় তাদের সকলের লাশ পড়ে আছে। (সহীহুল বুখারী, ১/৩৭)

উমাইয়া বিন খালাফের অভ্যাস ছিলো যে, সে যখনই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখতো, তখনই নানা ধরনের কটূক্তি করতো। মহান আল্লাহ তার সম্পর্কে নাযিল করেন ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ অর্থাৎ- 'ধ্বংস তাদের জন্যে যারা সামনে ও পেছনে নিন্দা করে।' ইবনে হিশাম বলেন, "হুমাযা" সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে প্রকাশ্যে গাল-মন্দ করে এবং চোখ বাঁকা করে ইশারা করে। আর "লুমাযা" সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে পশ্চাতে মানুষের নিন্দা করে এবং কষ্ট দেয়। (ইবনে হিশাম, ১/৩৫৬, ৩৫৭)

উমাইয়ার ভাই উবাই বিন খালাফ ছিলো উকবা বিন আবু মুয়াঈতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উকবা একদিন নবী (সা)-এর কাছে বসে কিছু কথা শুনছিলো। উবাই একথা শুনে উকবার সমালোচনা করলো এবং নির্দেশ দিলো, 'যাও, তুমি গিয়ে মুহাম্মাদের মুখে থু থু দিয়ে আস।' উকবা তাই করলো। উবাই বিন খালাফ একবার একটি পুরোনো হাড় গুড়ো করলো। এরপর সেই গুড়ো ফুঁ দিয়ে নবী (সা)-এর দিকে উড়িয়ে দিলো। (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১-৩৬২)

আখনাস বিন শুরাইকও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে অন্যতম ব্যক্তি ছিলো। আল কুরআনে তার নয়টি কু-অভ্যাসের কথা উল্লেখ করে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ـ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ ـ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ـ عُتُلٍ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ـ

"এবং অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, পশ্চাতে নিন্দাকারী, চোগলখুরী করে (একজনের কথা অন্যজনের নিকট লাগিয়ে দেয়), কল্যাণের কাজে বাধা প্রদান করে, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ়স্বভাবের অধিকারী এবং তদুপরি সে (জন্মের দিক থেকে) কুখ্যাত।" (সূরা আল কালাম ঃ ১০-১৩)

আবু জাহল প্রথম দিনই নবী (সা)-কে নামায আদায় করতে দেখে তাঁকে নামায

www.amarboi.org

থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। একবার নবী (সা) মাকামে ইব্রাহীমের কাছে নামায আদায় করছিলেন, আবু জাহল সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, সে বললো ঃ মুহাম্মাদ, আমি কি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করিনি? সাথে সাথে সে হুমকিও দিলো। নবী (সা)ও হুমকি দিয়ে জবাব দিলেন। আবু জাহল বললো, মুহাম্মাদ, তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছো? দেখ, এ মক্কা নগরীতে আমার মজলিসই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জাঁকজমকপূর্ণ। আবু জাহলের এ হেন দাম্ভিকতার জবাবে আয়াত নাযিল হয় فليدع ناديه "আচ্ছা সে যেনো তার সঙ্গী-সাথীদের ডাকে। আমি শাস্তি দেয়ার ফেরেশতাদেরকে ডাকবো।" (আততাফসীর ফি যিলাযিল কুরআন। সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) ৩০/২০৮) একটি বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা) আবু জাহলের চাদর গলার কাছে ধরে বললেন, দুর্ভোগ, তোমার জন্য দুর্ভোগ। দুর্ভোগ, তোমার জন্য দুর্ভোগ। (আততাফসীর ফী যিলালিল কুরআন)। একথা শুনে আল্লাহর এ দুশমন বললো, হে মুহাম্মাদ, আমাকে হুমকি দিচ্ছো? আল্লাহর কসম, তুমি এবং তোমার প্রভু আমার কিছুই করতে পারবে না। মক্কার উভয় পাহাড়ের মাঝে চলাচলকারীদের মধ্যে আমি সবচাইতে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি।

আল কুরআনে ঘোষিত হুমকি সত্ত্বেও আবু জাহল তার বিবেক বহির্ভূত আচরণ থেকে বিরত থাকেনি। বরং তার হিংস্রতা ও পাশবিকতা আরো বেড়ে গিয়েছিলো। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে ঃ কুরাইশ নেতাদের নিকট একদিন আবু জাহল বললো, মুহাম্মাদ তোমাদের সামনে নিজের চেহারায় ধুলি লাগিয়ে রাখে কি? কুরাইশ নেতারা বললো হ্যাঁ। আবু জাহল বললো, লাত ও ওজ্জার শপথ, আমি যদি তাকে এ অবস্থায় দেখি, তবে তার ঘাড় ভেঙ্গে দেবো, তার চেহারা মাটিতে হেঁচড়াবো। এরপর আবু জাহল আল্লাহর রাসূল (সা)-কে সালাত আদায় করতে দেখে তার ঘাড় ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে অগ্রসর হলো। কিন্তু হঠাৎ উপস্থিত সকলেই দেখলো যে, সে কাতচিৎ হয়ে পড়ছে আর চিৎকার করে বলছে, বাঁচাও বাঁচাও। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আবুল হিকাম, তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমি দেখলাম, আমার ও মুহাম্মাদের মাঝে আগুনের একটি পরিখা। কি ভয়াবহ দৃশ্য! দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আল্লাহর রাসূল (সা) একথা শুনে বললেন, সে যদি আমার কাছে আসতো, তবে ফেরেশতা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে ফেলতো। (ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি গ্রহণ করেছেন)

সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোন সম্মানিত ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কথা শুনলে, আবু জাহল

www.amarboi.org

তাঁকে গালমন্দ ও লাঞ্ছিত করতো। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত করার হুমকি দিতো। কোন দুর্বল মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁকে মারধর করতো এবং অন্যদেরকেও লেলিয়ে দিতো। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২০)

হযরত মুসআব বিন উমাইর (রা) উসলাম গ্রহণ করার পর তার মা পুত্রের পানাহারের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয় এবং তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেয়। হযরত মুসআব (রা) ছোট বেলা থেকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন। পরবর্তীতে পরিস্থিতির কারণে তিনি এমন করুণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, তাঁর গায়ের চামড়া খোলস ছাড়ানো সাপের মত হয়ে গিয়েছিল। (রাহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮)

হযরত বিলাল (রা) ছিলেন উমাইয়া ইবনে খালাফের ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণের পর উমাইয়া হযরত বিলাল (রা)-কে গলায় দড়ি বেঁধে উচ্ছৃঙ্খল বালকদের হাতে তুলে দিতো। বালকেরা তাঁকে মক্কার বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেতো। এ কারণে হযরত বিলালের গলায় রশির দাগ পড়ে গিয়েছিলো। উমাইয়া নিজেও তাঁকে বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার করতো। এর পর উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে রাখতো। হযরত বিলাল (রা)-কে প্রায়ই অনাহারে রাখা হতো। কখনো কখনো দুপুরের রোদে মরু বালুকার ওপর জোর করে শুইয়ে তাঁর উপর ভারি পাথর চাপা দিয়ে রাখা হতো। বলা হতো, মৃত্যু পর্যন্ত তোকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে। বাঁচতে হলে মুহাম্মাদের পথ ছাড়তে হবে। কিন্তু তিনি এহেন কষ্টকর পরিস্থিতিতেও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে থাকতেন ঃ احد। احد। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর ওপর নির্যাতন চলতে দেখে হযরত আবু বাকর (রা) একদিন খুবই ব্যথিত হলেন। তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে অন্য একজন কালো ক্রীতদাসের বিনিময়ে, মতান্তরে দু'শ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা) ছিলেন বানু মাখজুমের সাথে চুক্তিবদ্ধ এক পরিবারের লোক। তিনি এবং তাঁর পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণের পর তাঁদের নির্যাতন ও নিপীড়ণ শুরু হয়ে গেলো। আবু জাহলের নেতৃত্বে মুশরিকরা তাঁদেরকে উত্তপ্ত রোদে বালুকাময় প্রান্তরে শুইয়ে কষ্ট দিতো। একবার তাঁদেরকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছিলো। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'হে ইয়াসিরের পরিবার, ধৈর্যধারণ কর। তোমাদের

www.amarboi.org

ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।' অত্যাচার সহ্যের সীমা পার হয়ে যাওয়ায় হযরত ইয়াসির (রা) দুনিয়া ছেড়ে জান্নাতের দিকে যাত্রা করেন। তাঁর স্ত্রী হযরত আম্মারের আম্মা হযরত ছুমাইয়া (রা)-এর লজ্জাস্থান টার্গেট করে দুর্বৃত্ত ও অভিশপ্ত আবু জাহল বর্শা নিক্ষেপ করে। এতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদাহ (اللهم اجعل الجنة مثواها)। হযরত আম্মারের উপর তখনো অব্যাহতভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছিলো। তাঁকে কখনো উত্তপ্ত বালুকার উপর শুইয়ে রাখা হতো, কখনো বুকের উপর প্রকাণ্ড পাথর চেপে দেয়া হতো, কখনো পানিতে চেপে ধরা হতো।

মুশরিকরা অত্যন্ত নির্মম ও নির্দয়ভাবে ইসলাম গ্রহণকারীদের শাস্তি দিতো। তারা কোন কোন সাহাবীকে উট এবং গাভীর কাঁচা চামড়ার ভেতর ঢুকিয়ে বেঁধে রোদে ফেলে রাখতো। কাউকে লোহার বর্ম পরিয়ে গরম পাথরের উপর শুইয়ে রাখতো।[৬]

এ ধরনের নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেও মক্কার কাফির মুশরিকরা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার মতো ক্ষীণ আশার আলোও দেখতে পায়নি। মহানবী (সা)-এর প্রতি তাঁর সাহাবীদের গভীর ভালোবাসা, প্রাণঢালা শ্রদ্ধা, তাঁর জন্য তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীতে কোন প্রকার নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। এতে কুরাইশ নেতাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মধ্যে আরো নতুন মাত্রা যোগ হলো। তারা রাসূল (সা)-কে হত্যা করার চিন্তা ভাবনা শুরু করলো। কিন্তু এরই মধ্যে দুই বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা হযরত হামযা (রা) এবং হযরত উমার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

ইবনে হিশাম এবং ইবনে জাওযী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমার (রা) ইসলাম গ্রহণের পর জামিল ইবনে মুয়াম্মার মাহমির কাছে গেলেন। কোনো কথা প্রচারের ক্ষেত্রে কুরাইশদের মধ্যে এই লোক ছিলো বিখ্যাত। হযরত উমার (রা) তাকে বললেন, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি'। এই কথা শোনার সাথে সাথে সে চিৎকার করে উঠলো, 'খাত্তাবের পুত্র বেদীন হয়ে গেছে।' হযতর উমার (রা) বললেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলেছো, আমি মুসলিম হয়েছি।' মুশরিকরা হযরত উমারের (রা) উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাঁকে মারধর করতে লাগলো। হযরত উমার (রা) নিজেও আঘাতের মুকাবিলা করতে লাগলেন। ওরা ছিলো সংখ্যায় অনেক বেশি। হযরত উমার (রা) ক্লান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন। এরপর বললেন, 'যা

৬. রাহমাতুল্লিল আলামীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮

www.amarboi.org

খুশী কর। আল্লাহর শপথ, যদি আমরা সংখ্যায় তিনশ জনও হতাম তাহলে মক্কায় হয় তোমরা থাকতে, না হয় আমরা থাকতাম।'[৮]

মুশরিকরা হযরত উমার (রা)-কে প্রাণে মেরে ফেলার জন্যে তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়। সহীহ্ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে যে–

হযরত উমার (রা) ভীত অবস্থায় ঘরের মধ্যে ছিলেন। এসময় আছ বিন ওয়ায়েল আছছাহমী আবু আমর আসলেন। তিনি কারুকাজ করা ইয়ামানী চাদর এবং রেশমী পোশাক পরিহিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ছাহাম গোত্রের সদস্য। তিনি ছিলেন আমাদের মিত্র গোত্রের লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, এতো হৈ-হল্লা কিসের? হযরত উমার (রা) বললেন, 'আমি মুসলিম হয়েছি। এ কারণে তোমার কওম আমাকে মেরে ফেলতে চায়।' আছ বললেন, 'এটা হতে পারে না।' হযরত উমার (রা) বলেন, 'একথা শুনে আমি বড়ই স্বস্তি বোধ করলাম। বহু লোক সে সময় আমার বাড়ির আশে পাশে ভীড় করছিলো। আছ ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সকলে কোথায় যাচ্ছো? সকলে বলে উঠলো, এই যে খাত্তাবের বেটা উমার, সেতো বেদীন হয়ে গেছে, তার নিকট যাচ্ছি। আছ বললেন, সেদিকে যাওয়ার কোন পথ নেই। একথা শুনে সকলেই ফিরে চলো গেলো।'[৯]

মুজাহিদ হযরত ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি উমার বিন খাত্তাবকে জিজ্ঞেস করলাম যে কি কারণে আপনার উপাধি ফারুক হয়েছে? তিনি বললেন, আমার ইসলাম গ্রহণের তিন দিন আগে হযরত হামজা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পর হযরত উমার (রা) হযরত হামজার (রা) ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, এর পর আমি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা)-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, মরে যাই বা বেঁচে থাকি, আমরা কি হকের উপর নেই?' রাসূল (সা) বললেন, 'কেন নয়? সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা বেঁচে থাক বা মরে যাও, নিশ্চয়ই তোমরা হকের উপর রয়েছো।' হযরত উমার (রা) বললেন, এর পর আমি বললাম, 'তাহলে আমরা কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছি? সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয়ই আমরা বাইরে বের হবো। এর পর আমরা দুই কাতারে বিভক্ত হয়ে মিছিল করে আল্লাহর রাসূলকে (সা) সঙ্গে নিয়ে বাইরে বের হলাম। এক কাতারে ছিলেন

৮. তারীখে ওমার ইবনুল খাত্তাব, পৃ. ৮, ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮, ৩৪৯

৯. সহীহ আল বুখারী, باب الاسلام عمر بن الخطاب , ১/৫৪৫

www.amarboi.org

হযরত হামজা (রা), অন্য কাতারে আমি। আমাদের চলার পথে যাঁতায় পেঁষা আটার মতো ধূলো উড়ছিলো। আমরা মাসজিদে হারামে প্রবেশ করলাম। কুরাইশরা আমাদেরকে দেখে মনে এতোবড় কষ্ট পেলো, যা ইতিপূর্বে পায়নি। সেই দিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে "আল ফারুক" উপাধি দিলেন।[১০]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হযরত উমারের (রা) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে পরবর্তীকালে আমরা শক্তিশালী এবং সম্মানিত ছিলাম।[১১]

হযরত আবু বাকর ইবনে কুহাফা (রা) একদিন মক্কার রাস্তায় মারাত্মকভাবে প্রহৃত হলেন, মুশরিকরা তাঁকে পায়ের নীচে রেখে জুতা দিয়ে মাড়ালো। এ সময় উতবা বিন রাবিয়া তাঁর নিকট এলো। এ দুর্বৃত্ত হযরত আবু বাকর (রা)-কে দুইটি তালিযুক্ত জুতো দিয়ে বেদম প্রহার করলো।

হযরত আবু বাকর (রা) আল্লাহর রাসূলের খবর জানতে চাইলেন। উম্মু জামীল উম্মুল খায়েরের প্রতি ইশারা করলেন। হযরত আবু বাকর (রা) বললেন, অসুবিধা নেই। উম্মু জামীল বললেন, তিনি ভাল আছেন এবং দারুল আরকামে আছেন। হযরত আবু বাকর (রা) বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমাকে আল্লাহর রাসূলের কাছে না নেয়া পর্যন্ত আমি কোন কিছুই পানাহার করবো না। উম্মুল খায়ের এবং উম্মু জামীল অপেক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যার পর লোক চলাচল কমে গেলে এবং অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে হযরত আবু বাকর আছ ছিদ্দীক (রা) তাঁর মা উম্মুল খায়ের এবং উম্মু জামীলের কাঁদে ভর দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে হাজির হলেন।[১২]

হযরত খাব্বাব বিন আরাত (রা) বলেন ঃ আমি একদা আল্লাহর রাসূল (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসলাম। তিনি তখন একখানা চাদর বালিশ বানিয়ে খানায়ে কা'বার ছায়ায় আরাম করছিলেন। ঐ সময়ে আমরা মুশরিকদের হাতে ভীষণভাবে অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা) আপনি কি মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করবেন না? এ কথা শুনে তিনি উঠে বসলেন। তাঁর চেহারা মুবারক রক্তিম হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী সময়ে ঈমানদারদের অবস্থা এমনও হয়েছিলো যে, লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের গোশত খুলে নেয়া হতো। দেহে অবশিষ্ট থাকতো

---

১০. তারীখে ওমর ইবনুল খাত্তাব, ইবনে জওযী, পৃ. ৬,৭

১১. সহীহ আল বুখারী باب الاسلام عمر بن الخطاب ১ম, খণ্ড, পৃ. ৫৪৫

১২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০

www.amarboi.org

গোশতবিহীন হাড়। এরূপ অত্যাচারও তাদেরকে আল্লাহর দীন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। এরপর বললেন, আল্লাহ তাঁর এ দীনকে পূর্ণতা দান করবেন। একজন অশ্বারোহী সানআ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে, শুধু আল্লাহর ভয় ছাড়া তার অন্তরে অন্য কারো ভয় থাকবে না। বর্ননাকারী বলছেন, তবে হাঁ, বকরীর ওপর বাঘের ভয় তখনো থাকবে।[১৩] অন্য আরো একটি বর্ণনায় এসেছে, কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো।[১৪]

উল্লেখ্য যে, এসব সুসংবাদ কোনো গোপনীয় বিষয় ছিল না। এসব কথা ছিলো সর্বজন বিদিত। মুসলিমদের মতোই কাফিররাও এসব জানতো। সুতরাং আসওয়াদ বিন মুত্তালিব এবং তার বন্ধুরা সাহাবায়ে কিরামকে দেখলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, তোমাদের কাছে সারা দুনিয়ার বাদশাহ এসে পড়েছে। ওরা খুব শীঘ্রই কিসরা-কাইসারকে পরাজিত করবে। এসব কথা বলে তারা শিষ মারতো এবং হাততালি দিতো।[১৫]

মি'রাজ এক বিশাল নিয়ামাত

আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, একদিকে সীমাহীন নির্যাতন আর অন্যদিকে দূর দিগন্তে তারার আলোর ঝিলিমিলি এ দু'য়ের মাঝামাঝি পর্যায়ে ধরা দিলো এক বিশাল নিয়ামাত। আল কুরআনের ভাষায় ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

"পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি যিনি নিজ বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে কুদরাতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি মহা শ্রবণকারী ও সর্বদর্শী।" (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ১)। এ হচ্ছে মি'রাজের ব্যাপারে আল কুরআনের অকাট্য দলীল।

---

১৩. সহীহ আল বুখারী, ১/৫৪৩

১৪. সহীহ আল বুখারী, ১/৫৪৩

১৫. ফিকহুচ্ছিরাহ, পৃ. ৮৪

www.amarboi.org

কখন ঘটেছিল এ অলৌকিক ঘটনা

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, মি'রাজের সময় নির্ধারণ নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে।

* কেউ বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়াতের মহান মর্যাদাপ্রাপ্তির বছরই মি'রাজের ঘটনা ঘটেছিলো। আত্ তাবারানী এ মতই পছন্দ করেছেন।
* কেউ বলেছেন ঃ নবুয়াতের পাঁচ বছর পর মি'রাজ হয়েছিলো। ইমাম নববী এবং ইমাম কুরতুবী এ মত পছন্দ করেছেন।
* কেউ বলেছেন ঃ নবুয়াতের ১০ম বছর রজব মাসের ২৭শে রাত্রে মি'রাজ হয়েছিলো। আল্লামা মানসুরপুরী এ মতের পক্ষে ।
* কেউ বলেছেন ঃ মদীনায় হিজরাতের ১৬ মাস পূর্বে নবুয়াতের দ্বাদশ বছর রমজান মাসে মি'রাজ হয়েছিলো।
* কেউ বলেছেন ঃ হিজরাতের বার মাস পূর্বে নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছরের মুহাররাম মাসে মি'রাজ হয়েছিলো।
* কেউ বলেছেন ঃ হিজরাতের এক বছর পূর্বে নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে মি'রাজ হয়েছে।

মূলকথা মি'রাজ কোন্ তারিখে হয়েছিলো, এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট তথ্য কিতাব ও সুন্নায় আসেনি। যার কারণে মতের বিভিন্নতার সূত্রপাত হয়। দিন তারিখ উল্লেখ না থাকার কারণে মি'রাজের বিশাল ঘটনায় কোনো প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি। ঘটনাটাই ছিলো মূল বিষয়। যদি দিন তারিখটা এখানে প্রয়োজনীয় কোন বিষয় হতো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) কর্তৃক সেটা সুস্পষ্টভবে অবশ্যই জানিয়ে দেয়া হতো।

মি'রাজের ঘটনার বিভিন্ন দিক ছোট বা বড় আকারে অধিক সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে একটি কথাও বর্ণিত হয়নি। সাহাবীগণ কখনো তাঁকে তারিখ সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি। পরবর্তী যুগের তাবেয়ীদেরও একই অবস্থা। তাঁরা তারিখ সম্পর্কে কোনো প্রকার প্রশ্ন বা উত্তরের দিকে মানেযোগ দেননি। কারণ তাঁদের কাছে তারিখের বিষয়টির কোনো মূল্য ছিল না। এ সকল হাদীসের শিক্ষা গ্রহণই তাঁদের নিকট মুখ্য বিয়ষ ছিলো। তারিখের বিষয় নিয়ে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মি'রাজ একবার না একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে, কোন্ বছর হয়েছে, কোন্ মাসে হয়েছে, কোন্ তারিখে হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে তাবেয়ী ঐতিহাসিকগণ মি'রাজের ঘটনা ঐতিহাসিক-ভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করতে পারেননি। পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ মি'রাজের তারিখ বিষয়ক মতভেদ ও কারণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবনে কাছীর (৭৭৪ হিঃ), ইবনে হাজার আল আসকালানী (৮৫২ হিঃ), আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আলকাসতালানী (৯২৩ হিঃ), মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আশশামী (৯৪২ হিঃ), আবদুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হিঃ) ও অন্যরা এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।[১৬]

এতে মতবিরোধের কারণ হলো হাদীসের বর্ণনায় এ বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সাহাবী ও তাবেয়ীগণও এ ব্যাপারে কোনো তথ্য পরিবেশন করেননি। তবে তাবেয়ীদের যুগে তারিখ নিয়ে কথা শুরু হয়।

রজব মাসের ২৭ তারিখে মি'রাজ হয়েছিল বা এ তারিখটি লাইলাতুল মি'রাজ এ কথাটি তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকগণের অনেক মতের মধ্যে ১টি মত মাত্র। এ কথাটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ জালালাইন শরীফে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে –

فانعم عليه بالاسراء المشتمل على اجتماعه بالانبياء وعروجه الى السماء ورءيته عجائب الملكوت ومناجاته تعالى -

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাঁর হাবীব (সা)-কে ইস্‌রা দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁকে অন্য নবীগণের সাথে একত্রিত হওয়ার এবং উর্ধলোকে আরোহণ করে আসমানে পদার্পণ করার এবং মালাকুতী জগতের অতি বিস্ময়কর অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করার এবং মহান আল্লাহর সাথে মত বিনিময় করার সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।[১৭]

আল কুরআনে ঘটনা বর্ণনার শুরু হয়েছে, سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى দ্বারা। এভাবে এবং এ ভাষায় বর্ণনা শুরু করা থেকে স্বতঃই প্রমাণিত হয়ে যে, এটি একটি অতি বড় অস্বাভাবিক ঘটনা ছিলো, যা মহান আল্লাহর অসীম কুদরাতের ফলেই সংঘটিত হয়েছিলো।[১৮]

---

১৬. দেখুন, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ইবনে কাসীর, ২/৪৭০–৪৮০, সুবুলুল হুদা (আস-সিরাহ আশ শামিয়া) আশ-শামী, ৩/৬৪-৬৬, আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ, আল্ কাসতালানী ২/৩৩৯-৩৯৮

১৭. জালালাইন শরীফ, সূরা আল ইসরা ১ম আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

১৮. তাফহীমুল কুরআন, আলউসতাজ সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মাওদূদী (র), সূরা বনী ইসরাঈলের ১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রথম যাত্রাবিরতি

আল কুরআন বলছে ঃ পবিত্র তিনি যিনি রাতের বেলা তাঁর বান্দাহকে মাসজিদে হারাম থেকে দূরবর্তী সে মাসজিদ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন, যার চতুষ্পার্শ বরকতময়, যেন তাঁকে কিছু নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ করাতে পারেন। আল কুরআন এখানে কেবল মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যাত্রার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। আর এ গমনের উদ্দেশ্যরূপে উল্লেখ করেছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখাতে চেয়েছেন। আল কুরআনে বিষয়টি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে। সুতরাং মি'রাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদেরকে হাদীসের ওপর নির্ভর করতে হবে। হাদীস ও জীবন চরিত গ্রন্থাবলীতে এ বিশাল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বহু সংখ্যক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত মালিক বিন ছাছাআ, হযরত আবু যার আল গিফারী ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে সর্বাধিক বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া হযরত উমার, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত ইবনুল আব্বাস, হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী, হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান, হযরত আয়িশা এবং আরো কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা)-এর কোনো কোনো অংশ বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীস তাফসীরে জালালাইনে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইতুল মাকদিছে মি'রাজ সফরের প্রাথমিক যাত্রা বিরতি প্রসঙ্গে হাদীসটির বর্ণনা ঃ

حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البنانى عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابيت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار دون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التى يربطه الا انبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءنى جبرائيل باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبرائيل عليه السلام اخترت الفطرة -

www.amarboi.org

হযরত শাইবান বিন ফারুক হযরত হাম্মাদ বিন সালামা থেকে তিনি হযরত ছাবিত আলবুনানী থেকে তিনি হযতর আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার বাহন হিসেবে বুরাক নিয়ে আসা হয়েছে। বুরাক হলো একটি জন্তু, এর গায়ের রং ধবধবে সাদা, জন্তুটি দেখতে লম্বা আকৃতির, শরীরের দিক থেকে গাধা এবং খচ্চরের মাঝামাঝি আকৃতির। এতই দ্রুত গতিসম্পন্ন যে, মুহূর্তের মধ্যে সে দৃষ্টির শেষপ্রান্ত অতিক্রম করতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, (আমি মি'রাজ যাত্রায়) এ দ্রুতগতিসম্পন্ন যানটিতে আরোহণ করলাম আর এক নিমিষে বাইতুল মাকদিসে এসে পৌছে গেলাম। তিনি বলেন আমি সেখানে পৌছে ঐ খুঁটির সাথে বুরাকটি বেঁধে নিলাম, সওয়ারী বাঁধার কাজে অন্যান্য নবী যে খুঁটিটি ব্যবহার করতেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি মাসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। এরপর দু'রাকআত সালাত আদায় করলাম। অন্য বর্ণনায় এসেছে আমি অন্যান্য নবীর উপস্থিতিতে তাঁদের ইমাম হয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করলাম। এরপর হযরত জিব্রাঈল (আ) আমার নিকট দুটো পানপাত্র নিয়ে আসলেন। একটিতে ছিলো দুধ এবং অপরটিতে ছিলো মদ। আমি দুধের পেয়ালাটাই গ্রহণ করলাম। এতে হযরত জিব্রাঈল (আ) বললেন, আপনি সহজাত পথই বেছে নিয়েছেন।

এ ছিলো বাইতুল মাকদিছ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সফরের বিবরণ। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, হাদীসটি খুবই দীর্ঘ। এর অবশিষ্ট অংশে বাইতুল মাকদিছ থেকে উর্ধলোকে তথা মহাশূন্যের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ১ম আসমান, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ৬ষ্ঠ ও ৭ম আসমান অতিক্রম করে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পরিভ্রমণের বিশদ বিবরণ এসেছে।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি মি'রাজ একটি বিশাল মুজিজা, এক অলৌকিক ঘটনা। মহান আল্লাহর কুদরাতে এমন এক সময়ে এ ঘটনা ঘটেছিলো, যখন পর্যন্ত আধুনিক টেকনোলজির বিকাশ ঘটেনি। আকাশ পথে যাতায়াতের কোনো প্রযুক্তি তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। উড়ো জাহাজ, রকেট ইত্যাদি এর শত শত বছর পরের আবিষ্কার। বর্তমান সময় পর্যন্ত Technologycal advancement বা প্রযুক্তির অগ্রগতি যে পর্যায়ে এসেছে, মহাকাশ, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির ওপর গবেষণায় যে পরিমাণ তথ্য আমাদের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, এতে বস্তুত মানুষ মহান আল্লাহর অনন্ত অসীম রাজ্যের সামান্যতম অংশ মাত্র পর্যবেক্ষণের মধ্যে আনতে পেরেছে বলা চলে, এর বেশি কিছু নয়।

www.amarboi.org

বিজ্ঞানীদের পরিবেশিত তথ্যানুযায়ী মহাকাশে অবস্থিত সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজি, এদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথ রয়েছে। ওরা ওদের নিজস্ব কক্ষপথেই বিচরণ করছে। মহানবী (সা)-এর এ বিশাল ভ্রমণের কোনো পরিধি বা পরিমাপ আমরা হয়তো নির্ণয় কতে পারবো না, তবে বিজ্ঞানীদের তথ্যের প্রতি মনোযোগ দিলে আমরা কিঞ্চিত ধারণা নিতে পারি।

আমাদের এ পৃথিবী যে সৌরলোকে অবস্থিত তা এতই বিরাট ও বিশাল যে, এর কেন্দ্র যেই সূর্য, তা আকারে পৃথিবীর তুলনায় তেরো লক্ষ গুণ বড়। অন্যতম গ্রহ নেপচুন সূর্য হতে অন্ততঃ দু'শত উনাশি কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। আর প্লুটোকে যদি দূরতম গ্রহ ধরা হয়, তবে তা সূর্য থেকে চার শত ষাট কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। এ বিরাটত্ব ও বিশালতা সত্ত্বেও এ সৌরলোক আরো অনেক বড় ছায়া পথের একটা ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া অধিক কিছু নয়। যে ছায়াপথে আমাদের এ সৌরলোক অবস্থিত এতে প্রায় তিন হাজার মিলিয়ন অর্থাৎ তিন শত কোটি সূর্য আছে। এর নিকটতম সূর্য আমাদের এ পৃথিবী হতে এতো দূরে অবস্থিত যে, এর আলো এখানে আসতে চার বছর সময় লাগে। (অথচ আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল)। উল্লেখ্য যে, এ বিশাল ছায়াপথ বা GALAXY-ই সমগ্র বিশ্বলোক নয়। বর্তমান কালের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়েছে যে এটি বিশ লক্ষ নিহারিকা পুঞ্জের (NEBULA) মধ্যে মাত্র ১টি। এর মধ্যে নিকটবর্তী নিহারিকা আমাদের থেকে এতো বেশি দূরত্বে অবস্থিত যে, এর আলো দশ লক্ষ বছরে আমাদের এ যমীনে এসে পৌছায়। আর দূরবর্তী যেসব গ্রহ-উপগ্রহ আমাদের বর্তমান যন্ত্র-পাতিতে ধরা পড়ে, এর আলো পৃথিবীতে পৌছাতে দশ কোটি বছরের প্রয়োজন।[১৯] ঊর্ধ্বলোকের বিশালত্বের ওপর ভবিষ্যতে হয়তো আরো নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে। এ যাবৎকালের প্রাপ্ত তথ্য সামনে রেখে যদি আমরা মি'রাজের বাকী অংশটুকু আলোচনা করি, তবে সর্বযুগের সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গকারী এ মহাকাশ ভ্রমণ আমাদের সামনে এ বাস্তব সত্যটুকু অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেবে যে, আমাদের বিজ্ঞানের অবদান এ পর্যন্ত যে মানযিলে গিয়ে পৌছেছে, (যদি সেটা মঙ্গল গ্রহকেও ধরা হয়), চৌদ্দশত বছর আগে মহান আল্লাহর কুদরাতে তাঁর নবীর সফর হয়েছে আরো অনেক দূরে। এর নামই মুজিযা।

---

১৯. তাফহীমুল কুরআন, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র), সূরা ইয়াসিনের ৩৭নং টীকা দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

বিরতির পর পুনঃ যাত্রা

বাইতুল মাকদিসে সাময়িক যাত্রা বিরতির পর মহানবী (সা) হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর সাথে মহান আল্লাহর কুদরাতে উর্ধলোকে যাত্রা করেন। এ ব্যাপারে সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য সহীহ হাদীস গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত বিবরণ আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম এভাবে লিখেছেন ঃ

এরপর সেই রাতেই তাঁকে বাইতুল মাকদিস থেকে প্রথম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর অনুরোধে দরজা খুলে দেয়া হয়। নবীজী (সা) সেখানে হযরত আদম (আ)কে দেখে সালাম করেন। হযরত আদম (আ) সালামের জবাব দেন এবং মারহাবা বলে তাঁকে স্বাগত জানান। তাঁর জন্য দু'আয়ে খায়ের করেন। তাঁর নবুয়াতের স্বীকারোক্তি করেন। সে সময় আল্লাহ পাক হযরত আদমের ডানদিকে নেককার এবং বামদিকে বদকারদের রূহ নবী (সা)-কে দেখান। এরপর তিনি দ্বিতীয় আসমানে যান, দরজা খুলে দেয়া হয়। মহানবী (সা) সেখানে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ) এবং হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) -কে দেখে সালাম দেন। তাঁরা সালামের জবাব দিয়ে মহানবী (সা)-এর নবুয়াতের কথা স্বীকার করেন। এরপর তিনি তৃতীয় আসমানে যান। সেখানে হযরত ইউসুফ (আ)-কে দেখে তাঁকে সালাম জানান। হযরত ইউসুফ (আ) সালামের জবাব দেন এবং মারহাবা বলে তাঁকে খোশআমদেদ জানান এবং তাঁর নবুয়াতের কথা স্বীকার করেন। এরপর মহানবী (সা) চতুর্থ আসমানে যান। সেখানে হযরত ইদ্রীস (আ)-কে দেখে তাঁকে সালাম জানান। হযরত ইদ্রীস (আ) সালামের জবাব দেন, তাঁকে মারহাবা বলে স্বাগত জানান এবং তাঁর নবুয়াতের কথা স্বীকার করেন। সেখান থেকে তিনি পঞ্চম আসমানে যান। সেখানে হযরত হারুন বিন ইমরানের (আ) সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে সালাম জানান। হযরত হারুন (আ) সালামের জবাব দেন, তাঁকে মারহাবা বলে স্বাগত জানান এবং তাঁর নবুয়াতের কথা স্বীকার করেন। তারপর তিনি ষষ্ঠ আসমানে যান। সেখানে তিনি হযরত মূসা ইবনে ইমরানের (আ) সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি তাঁকে সালাম জানান। হযরত মূসা (আ) তাঁর সালামের জবাব দেন, তাঁকে খোশ আমদেদ জানান এবং তাঁর নবুয়াতের কথা স্বীকার করেন। নবীজী (সা) সেখান থেকে বিদায় নেয়ার সময় হযরত মূসা (আ) কাঁদতে লাগলেন। কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, একজন নবী, যিনি আমার পরে প্রেরিত হয়েছেন, অথচ তাঁর উম্মাত আমার উম্মাতের চেয়ে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর তিনি ৭ম আসমানে তাশরীফ রাখলেন। সেখানে তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর

www.amarboi.org

সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে সালাম জানালেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানালেন এবং তাঁর নবুয়াতের স্বীকারোক্তি করলেন। এর পর তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় বাইতুল মামূরে।[২০] এ হচ্ছে বিভিন্ন সূত্রে উদ্ধৃত বুখারীর বর্ণনা।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে, ৭ম আসমানে তিনি (সা) হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সময়ে হযরত ইব্রাহীম (আ) বাইতুল মামূরের সাথে পিঠ হেলান দিয়ে বসেছিলেন। বাইতুল মামূরে প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন। যারা একবার বের হয়েছেন তারা পুনরায় আর প্রবেশের সুযোগ পাবেন না । সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) সিদরাতুল মুনতাহায় যান। সিদরাতুল মুনতাহা বৃক্ষের পাতাগুলো হাতীর কানের মত, তার ফলগুলো বৃহদাকারের মটকার মত। এ সময়ে সিদরাতুল মুনতাহা আল্লাহর কুদরাতে বেষ্টিত হয়ে এমন এক সৌন্দয্যমণ্ডিত রূপ পরিগ্রহ করল, কোনো সৃষ্টির পক্ষে এ সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সে সময়ে মহান আল্লাহ আমাকে ওহী করলেন, যা ওহী করা তাঁর মনজুর ছিলো। তিনি প্রতি দিবসে ও রজনীতে (মোট) ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফারয করেন। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার প্রভু আপনার উম্মাতের জন্যে কি ফারয করেছেন? জবাবে আমি বললাম, ৫০ ওয়াক্ত নামায। তা শ্রবণে হযরত মূসা (আ) বললেন, আপনার উম্মাত ৫০ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে সক্ষম হবে না। কাজেই আপনি ফিরে গিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে নামায কমিয়ে দেয়ার জন্যে আবেদন করুন। আমি এ পরামর্শ মুতাবিক আমার মহান রব এবং হযরত মূসা (আ)-এর মাঝে বার বার আসা যাওয়া করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমার মহান রব নির্দেশ দিলেন, হে মুহাম্মাদ! এ হচ্ছে ৫ ওয়াক্ত সালাত। প্রতি ওয়াক্ত মর্যাদার দিক থেকে ১০ গুণ করে বৃদ্ধি করে পাঁচ ওয়াক্তকে পঞ্চাশ ওয়াক্তের স্থলাভিষিক্ত করে দেয়া হলো। (আমার মহান রব আরো বললেন) কেউ যদি কোনো ভালো কাজের নিয়াত করে আমল করার পূর্বেই তাকে একগুণ সাওয়াব দেয়া হবে এবং আমল করার পর তা দশগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কোনো মন্দ কাজের নিয়াত করে, তবে সেটা করার আগ পর্যন্ত কোন গুণাহ লেখা হবে না। করার পর শুধু একটি গুণাহই লেখা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এরপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আপনি

২০. আররাহীকুল মাখতুম, আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, পৃ. ১৫৬।

www.amarboi.org

আবারো ফিরে গিয়ে সালাত আরো কমিয়ে দেয়ার জন্যে আপনার মহান প্রভুর দরবারে আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ ব্যাপারে আমি আমার মহান প্রভুর দরবারে বার বার গিয়েছি। আবারো যেতে লজ্জাবোধ করছি।[২১]

মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক আল্লাহকে দেখার প্রশ্নে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম ঃ

এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার (র) মতের কথাও উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে মূল কথা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক মহান আল্লাহকে চক্ষু দ্বারা দেখার বিষয়টি "لم تثبت اصلا" দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে মোটেই প্রমাণিত নয়। কোনো সাহাবী থেকে একথা বর্ণিত হয়নি। হযরত ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে যে বর্ণনাটি এসেছে এর অর্থ হচ্ছে অন্তর দিয়ে দেখা, চক্ষু দিয়ে নয়।[২২]

এরপর আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম বলেন ঃ সূরা النجم এর "ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى" এ আয়াতে (৫৩ ঃ ৮) যে নিকটতর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা মি'রাজের ঘটনায় আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়াকে বুঝানো হয়নি। সেটা মি'রাজের সময়ের চেয়ে ভিন্ন সময়ের কথা। কেননা সূরা আন নাজমে উল্লেখিত নিকটতর হওয়া এবং ঝুলে থাকার অর্থ (الدنو والتدلى) হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর الدنو والتدلى অর্থাৎ নিকটবর্তী হওয়া এবং শূন্যে ঝুলন্ত থাকা। যেমনটি হযরত আয়িশা (রা) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। উপরন্তু সূরাটির আয়াতসমূহের পরম্পরা দ্বারাও এ অর্থই প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে মি'রাজের ঘটনা প্রসঙ্গে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সে সকল হাদীসে উল্লেখিত الدنو والتدلى অর্থাৎ নিকটবর্তী হওয়া ও শূন্যে ঝুলে থাকার অর্থ মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া। সূরা আল আন্ নাজমের আয়াতের সাথে মি'রাজের ঘটনা সংক্রান্ত হাদীসের কোনো প্রকার বিরোধ বা মতদ্বৈততা নেই। বরং সেখানে বলা হয়েছে, তিনি দ্বিতীয়বার سدرة المنتهى এর নিকট তাঁকে দেখেছেন। যাঁকে দেখেছেন, তিনি হযরত জিব্রাঈল (আ)। অর্থাৎ নবীজী (সা) হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে তাঁর আপন আকার আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন।

২১. সহীহ মুসলিম, পৃ. নং ১/৯১।

২২. আররাহীকুল মাখতুম, আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, পৃ. ১৫৭।

www.amarboi.org

একবার পৃথিবীতে। আর দ্বিতীয়বার عند سدرة المنتهى সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। والله اعلم মহান আল্লাহই ভালো জানেন।[২৩]

রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক মহান আল্লাহকে চক্ষু দ্বারা দেখার ব্যাপারে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর ইলমী তাহকীক ঃ

সূরা আন্‌নাজম এর "لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى" অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তিনি তাঁর মহান রবের বিশাল নিদর্শনসমূহ অবলোকন করেছেন।" এ আয়াতে কারীমার তাফসীর প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক মহান আল্লাহকে চোখ দিয়ে দেখা বা না দেখার ব্যাপারে তথ্য নির্ভর বিশদ আলোচনা করেছেন। উসূলে হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত ইবনুল আব্বাসের হাদীসটিরও তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা মরহুম বলেন ঃ এ আয়াত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মহান আল্লাহকে নয়, তাঁর মহান মর্যাদা ও প্রতাপপূর্ণ নিদর্শনাদিই দেখেছিলেন। আর পূর্বাপর বিচারে এ দ্বিতীয় সাক্ষাতও তাঁর সাথেই হয়েছিলো, যাঁর সাথে সংঘটিত হয়েছিলো প্রথম সাক্ষাত। এ কারণে অনিবার্যরূপে এ কথা মেনে নিতে হবে যে, উচ্চতর দিক চক্রবালে তিনি প্রথমবার যাঁকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ নন, আর দ্বিতীয়বার "সিদরাতুল মুনতাহার" নিকট যাঁকে দেখেছিলেন, তিনিও আল্লাহ ছিলেন না। এ ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কোনো একটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) যদি মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ তা'আলাকে দেখে থাকতেন, তাহলে তা এত বড় একটা ব্যাপার হতো যে, এখানে এর স্পষ্ট ঘোষণা একান্তই জরুরী ও অবশ্যম্ভাবী ছিলো। হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ তিনি মহান আল্লাহকে দেখবার আবেদন করেছিলেন। জবাবে তাঁকে বলা হয়েছিলো لن ترانى তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। (সূরা আল মায়িদা ঃ ১৪৩)। এ দৃষ্টিতে বলা যায় যে, যে মর্যাদা হযরত মূসা (আ)-কে দেয়া হয়নি, সেটা যদি নবীজীকে দেয়া হতো, তবে এ ব্যাপারটি এতোটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যেতো যে, তা অবশ্যই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হতো। কিনতু আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে পারছি যে, নবী (সা) আল্লাহকে দেখতে পেরেছিলেন, এ মর্মে কোনো কথা আল কুরআনে আসেনি। মি'রাজ পরিভ্রমণের বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা

২৩. যাদুল মায়াদ ২/৪৭,৪৮, সহীহ বুখারী ১/৫০, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৭০, ৪৭১, ৪৮১, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ২/৬৪৪, সহীহ মুসলিম ১/৯১-৯৬।

www.amarboi.org

বনী ইসরাঈলেও বলা হয়েছে যে, আমরা আমাদের বান্দাহকে ভ্রমণ করিয়েছি এ জন্যে যে, "لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا" তাঁকে আমরা আমাদের নিদর্শসমূহ দেখাবো। আর এখানে সিদরাতুল মুনতাহায় উপস্থিতির ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, "لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى" তিনি তাঁর প্রভুর বিশাল নিদর্শনাদি অবলোকন করতে পেরেছেন। এসব কারণে নবী (সা) এ দু'টি স্থানেই মহান আল্লাহকে দেখেছেন, না কি তিনি জিব্রাঈল (আ)-কে দেখেছেন, এ পর্যালোচনার বাহ্যত কোনো অবকাশ ছিলো না। কিন্তু যে কারণে এ বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা হচ্ছে এ সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনাসমূহের পার্থক্য।

এখানে আমরা পর্যায়ক্রমে সেসব হাদীস উল্লেখ করছি, যেগুলো এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

এক. হযরত আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

সহীহ আল বুখারীতে কিতাবুত তাফসীরে হযরত মাসরুক বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে বললাম ঃ আম্মাজান, মুহাম্মাদ (সা) কি মহান আল্লাহকে দেখেছিলেন? তিনি এর জবাবে বললেন ঃ বাবা, তোমার একথায় আমার চুল কেঁপে উঠছে। তুমি কি এ কথা জাননা যে, তিনটি কথা এমন আছে, যে এগুলো দাবী করবে, সে মিথ্যাবাদী। এর মধ্যে একটি হলো এই যে, যে দাবী করবে যে, (মি'রাজের রাত্রে) নবী (সা) মহান আল্লাহকে দেখেছেন, সে মিথ্যাবাদী। হযরত আয়িশা (রা) তাঁর এ বক্তব্যের সমর্থনে আল কুরআন থেকে এ আয়াত দু'টো পেশ করেন ঃ لا تدركه الا بصار وهو يدرك الابصار অর্থাৎ "কোনো দৃষ্টি তাঁকে অবলোকন করতে পারে না, তিনি কিন্তু সকল দৃষ্টি অবলোকন করতে পারেন। অপর আয়াতটি হলো–

ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء ـ

অর্থাৎ– কোনো মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, মহান আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, তবে হ্যাঁ, সেটা হয় ওহীরূপে অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা মহান আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠাবেন এবং তিনি মহান আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে ওহী করবেন– যা তিনি চাইবেন।

এ বক্তব্যের পর হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে দু'বার তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন।

উক্ত হাদীসের একটি অংশ সহীহ আল বুখারীর কিতাবুত তাওহীদেও উদ্ধৃত

www.amarboi.org

হয়েছে। আর "কিতাবু বাদ্‌ইল খাল্‌ক" এ হযরত মাসরুকের যে বর্ণনাটি ইমাম বুখারী উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়িশা (রা)-এর এ কথাটি শুনে আরজ করলাম যে, তা হলে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ কি হবে? "ثم دنا فتدلى - فكان قاب قوسين او ادنى" এর জবাবে তিনি বললেন ঃ এ আয়াতে হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মানবীয় আকৃতিতে আসতেন। কিন্তু এবার তিনি তাঁর আসল আকৃতিতে রাসূল (সা)-এর নিকট এসেছেন। এতে সমস্ত দিক চক্রবাল তাঁর দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেলো।

হযরত আয়িশা (রা)-এর সাথে হযরত মাসরুক (রহ)-এর এ কথোপকথন সহীহ মুসলিমে كتاب الايمان -এর باب فى ذكر سدرة المنتهى এ অধিক বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ঃ হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ (সা) তাঁর রবকে দেখেছেন এ দাবী যে লোক করবে, সে মহান আল্লাহ সম্পর্কে অনেক বড় মিথ্যা কথা বলবে। হযরত মাসরুক (রহ) বলেন ঃ আমি এতক্ষণ ঠেস দিয়ে বসা ছিলাম। একথা শুনে উঠে বসলাম। আমি বললাম, উম্মুল মুমিনীন, তাড়াহুড়ো করবেন না। আল কুরআনে আল্লাহ কি বলেননি ولقد راه نزلة اخرى؟ এবং ولقد راه بالافق المبين হযরত আয়িশা (রা) জবাবে বললেন ঃ এ উম্মাতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম রাসূল (সা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি জবাবে বলেছেন ঃ

انما هو جبرائيل عليه السلام لم اره على صورته التى خلق عليها غيرهاتين المرتين - رأيته منهبطا من السماء سادا اعظم خلقه ما بين السماء والارض -

অর্থাৎ তিনি ছিলেন হযরত জিব্রাঈল (আ)। আমি তাঁকে তাঁর সে আসল আকৃতিতে– যে আকৃতিতে মহান আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, এ দু' বার ছাড়া আর কখনো দেখেনি। এ দু'বার আমি তাঁকে আকাশমণ্ডল হতে অবতরণকারী অবস্থায় দেখেছি। তখন তাঁর বিরাট সত্তা পৃথিবী ও আকাশের মধ্যকার সমস্ত শূন্য লোক পরিব্যাপ্ত করেছিলো।

ইবনে মারদুইয়া হযরত মাসরুকের এ বর্ণনাটি যে ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন তা হচ্ছে ঃ

হযরত আয়িশা (রা) বললেন, সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি আপনার আল্লাহকে দেখেছেন? তিনি জবাবে বললেন, আমিতো হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে আকাশমণ্ডল থেকে অবতরণ করতে দেখেছি।

www.amarboi.org

দুই. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) বর্ণনাসমূহ ঃ

সহীহ আল বুখারীর كتاب التفسير সহীহ মুসলিম এর كتاب الايمان জামে তিরমিযীর ابواب التفسير -এ যির বিন হুবাইশের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) فكان قاب قوسين او ادنى এর তাফসীর এভাবে করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে তাঁর ছয়শত ডানা বিশিষ্ট অবস্থায় দেখেছেন।

সহীহ মুসলিমের অপরাপর বর্ণনায় لقد راى এবং ما كذب الفواد مارای من ايت ربه الكبرى এর এই তাফসীরই যির বিন হুবাইশ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন ।

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে হযরত ইবনে মাসউদের এ তাফসীর যির বিন হুবাইশ ছাড়াও আবদুর রাহমান বিন ইয়াযীদ ও আবু ওয়ায়েল-এর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মুসনাদে আহমাদে যির বিন হুবাইশের আরো দু'টো বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। এতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) لقد راه نزلة اخرى- عند سدرة المنتهى এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبرائيل عليه السلام عند سدرة المنتهى عليه ستمائة جناح অর্থাৎ আমি জিব্রাঈল (আ)-কে ছিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখেছি তাঁর ছয়শত ডানা রয়েছে।

ইমাম আহমাদ (র) এ কথার বর্ণনা শাকীক বিন সালামা হতেও উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমি হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর মুখে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে বলেছেন, আমি হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে এরূপ আকৃতিতে সিদরাতুল মুনতাহায় দেখেছিলাম।

তিন. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর নিকট আতা বিন আবু রিবাহ لقد راه راى نزلة اخرى আয়াতটির তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেছেন ঃ নবী করীম (সা) হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে দেখেছেন। جبرائيل عليه السلام (সহীহ মুসলিম, كتاب الايمان)

চার. হযরত আবু যার আল গিফারী (রা) থেকে আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক এর দু'টি বর্ণনা ইমাম মুসলিম (র) তাঁর গ্রন্থের كتاب الايمان এ উদ্ধৃত করেছেন। একটি বর্ণনায় তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলে করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি আপনার আল্লাহকে দেখেছিলেন? তিনি জবাবে বলেছেন, نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ এতো হচ্ছে একটি নূর, আমি কিভাবে তা দেখবো? অন্য এক বর্ণনায়

www.amarboi.org

বলেছেন, আমার এ জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেছেন رأيت نورًا আমি নূর দেখতে পেয়েছি।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম তাঁর زاد المعاد গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রথম উত্তরটির তাৎপর্যে বলেছেন ঃ আমার ও আল্লাহর দর্শনের মাঝখানে নূর ছিলো প্রতিবন্ধক। আর দ্বিতীয় উক্তিটির তাৎপর্যে বলেছেন ঃ আমি আমার রবকে নয়, শুধু একটি নূর দেখেছি।

ইমাম নাসায়ী ও ইবনে আবু হাতীম হযরত আবু যারের (রা) কথাটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর রবকে দিল দ্বারা দেখেছিলেন, চক্ষু দ্বারা নয়।

পাঁচ. হযরত আবু মূসা আল আশআরী (রা) থেকে ইমাম মূসলিম (র) সহীহ মুসলিমে كتاب الايمان এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন, নবী মুস্তাফা (সা) বলেছেন ঃ ما انتهى اليه بصر من خلقه মহান আল্লাহ পর্যন্ত সৃষ্টি জগতের কারো দৃষ্টি পৌছা সম্ভবপর নয়।

ছয়. হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা)-এর বর্ণনাসমূহ ঃ

সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা)-এর নিকট ما كذب الفواد مارای ولقد راه نزلة اخرى এর তাৎপর্য জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর রবকে দিল দ্বারা দু'বার দেখেছেন। মুসনাদে আহমাদেও এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে।

ইবনে মারদুইয়া আতা ইবনে আবু রিবাহর সূত্রে হযরত ইবনুল আব্বাসের এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহকে চক্ষু দ্বারা নয়, দিল দ্বারা দেখেছিলেন।

সুনানে নাসায়ীতে হযরত ইকরামা (রা)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানে হযরত ইবনুল আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ اتعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام الموسى ولرؤية لمحمد ؟ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে খলীল হিসেবে গ্রহণ করে মর্যাদাবান করেছেন, হযরত মূসা (আ) কে কালীমুল্লাহ হিসেবে মর্যাদাবান করেছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে দর্শন দিয়ে মহা মর্যাদাবান করেছেন, এতে কি তোমরা বিস্ময়বোধ করছ?

হাকেমও তাঁর মুসতাদরাকে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে এটি সহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী শা'বীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত ইবনুল আব্বাস (রা) এক বৈঠকে বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর দর্শন দান ও কথা বলাকে হযরত মূসা

www.amarboi.org

(আ) ও হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ)-এর সাথে দু'বার কথা বলেছেন। আর নবী মুহাম্মাদ (সা) দু'বার তাঁকে দেখেছেন। ইবনুল আব্বাস (রা)-এর এ কথা শুনে মাসরুক (রা) হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) কি তাঁর আল্লাহকে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, তুমি এমন কথা বলছ, যা শুনে আমার লোমহর্ষণ হচ্ছে। অতঃপর হযরত আয়িশা (রা) ও হযরত মাসরুকের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে, তা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে আরো যেসব বর্ণনা এসেছে, তন্মধ্যে একটিতে তিনি বলেন, নবী (সা) আল্লাহকে দেখেছিলেন। অন্যটিতে তিনি বলেন, দু'বার দেখেছিলেন, আর তৃতীয়টিতে তাঁর উক্তি হলো, তিনি মহান আল্লাহকে দিল দ্বারা দেখেছিলেন।

মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনুল আব্বাসের একটি বর্ণনা এই ঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربى تبارك وتعالى আমি আমার রব আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছি। অপর একটি বর্ণনায় তিনি বলেন, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتانى ربى الليلة فى احسن صورة احسبه يعنى فى النوم রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, আজ রাত্রে আমার রব অতীব উত্তম আকার আকৃতিতে আমার নিকট এসেছেন। আমি মনে করি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ কথাটির তাৎপর্য হলো স্বপ্নযোগে তিনি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন।

আততাবারানী ও ইবনে মারদুইয়া ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আল্লাহকে দু'বার দেখেছেন। প্রথমবার চক্ষু দ্বারা, আর দ্বিতীয়বার দিল দ্বারা।

সাত. মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল কুরাযী বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোনো কোনো সাহাবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি আপনার আল্লাহকে দেখেছিলেন? তিনি এর জবাবে বললেন, আমি তাঁকে দু'বার দিল দ্বারা দেখেছি। ইবনে জারীর এ বর্ণনাটি এ ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন আমি তাঁকে চক্ষু দ্বারা নয়, দিল দ্বারা দু'বার দেখেছি।

আট. হযরত আনাস বিন মালিক (রা)-এর একটি বর্ণনা মি'রাজের বিবরণ প্রসঙ্গে শরীক ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রে ইমাম বুখারী (র) كتاب التوحيد এ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এ কথাগুলো আছে ঃ

www.amarboi.org

حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى كان منه قاب قوسين او ادنى فا وحى اللّه فيما اوحى اليه خمسين صلوة -

নবী করীম (সা) ছিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছার পর মহান আল্লাহ তাঁর সন্নিকটে আসলেন এবং তাঁর উপর ঝুলে থাকলেন, এমনকি উভয়ের মাঝে দু'ধনুক বা আরো কম দূরত্ব থাকলো। পরে আল্লাহ তাঁর প্রতি যেসব বিষয়ে ওহী করলেন তন্মধ্যে রয়েছে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের হুকুম। কিন্তু এ বর্ণনাটির সনদ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী, হাফিয ইবনে হাজার আল আসকালানী, ইবনে হাজম ও হাফিয আব্দুল হক الجمع بين الصحيحين গ্রন্থে যেসব আপত্তি তুলেছেন সেসব ছাড়াও সবচেয়ে বড় আপত্তি এই যে, এ কথাটি আল কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা কুরআনুল করীমে দুটি ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের কথা উল্লেখ আছে। এর মধ্যে একটি প্রথমে উচ্চতর দিগন্তে সংঘটিত হয়েছিলো এবং সেখানে دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى-এর ব্যাপারটি ঘটেছিলো। আর দ্বিতীয়টি ছিদরাতুল মুনতাহার নিকটে ঘটেছিলো, কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনায় এ দু'বারের দর্শনকে সংমিশ্রিত করে একাকার করে দেয়া হয়েছে। ফলে বর্ণনাটি কুরআনুল কারীমের বর্ণনার বিপরীত হওয়ার কারণে কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা যায় না।

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এবং হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোই সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী। কেননা এ দু'জনই সম্মিলিতভাবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এ দু'টি ক্ষেত্রেই তিনি আল্লাহকে নয়, হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে দেখেছিলেন এ বর্ণনাসমূহ কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট ঘোষণা ও বাণীসমূহের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। তা ছাড়া হযরত আবু যার (রা) ও হযরত আবু মূসা আল আশআরী (রা) বর্ণিত নবী (সা)-এর উক্তিসমূহ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে যেসব হাদীস হাদীসের গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হয়েছে এসব বর্ণনার মধ্যে স্তর এলোমেলো বা اضطراب দেখা যায়। যেমন, কোনো কোনো বর্ণনাতে তিনি এ উভয় দর্শন চক্ষু দ্বারা হয়েছে

www.amarboi.org

বলেছেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এ উভয় দর্শনকে দিলের দেখা বলেছেন, আবার কোনো বর্ণনায় একটি দর্শন চক্ষু দ্বারা এবং অন্যটি দিল দ্বারা হয়েছে বলেছেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় চক্ষু দ্বারা দেখাকে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেছেন। এসবের মধ্যে একটি বর্ণনায়ও তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোনো উক্তি উদ্ধৃত করেননি। আর যেখানে তিনি স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, সেখানে একেতো আল কুরআনের বর্ণনা করা এ দু'টো দর্শনের কোনো একটিরও উল্লেখ নেই, উপরন্তু এর একটি বর্ণনার ব্যাখ্যা অপরটি দ্বারা এ জানা যায় যে, নবী (সা) জাগ্রত অবস্থায় নয় স্বপ্ন যোগেই মহান আল্লাহকে দেখেছিলেন।

মুহাম্মাদ বিন কা'ব আলকুরাযী বর্ণিত হাদীসসমূহে যদিও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু তাতে ঐ সকল সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি, যাঁরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জবান মুবারক থেকে এ কথা শুনতে পেয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁর একটি বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, চক্ষু দ্বারা মহান আল্লাহকে দেখার কথা রাসূলুল্লাহ (সা) পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করেছেন।[২৪] والله ورسوله اعلم بالصواب.

মহান আল্লাহকে দর্শনের ব্যাপারে আল্লামা তাফতাজানীর অভিমত

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলাকে দেখার বিষয়টি অন্যতম আকীদাগত মাসআলা। এ ব্যাপারে কালাম শাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ "শরহে আকায়েদে নাসাফী"তে আল্লামা তাফতাজানী (র) তাঁর নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ ثم الصحيح انه عليه السلام راى ربه بفواده لا بعينه "অর্থাৎ এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হলো এই যে, নবী (সা) নিঃসন্দেহে তাঁর রবকে দিল দিয়ে দেখেছেন, চোখ দিয়ে নয়।[২৫]

মহান আল্লাহকে দেখার বিষয় নিয়ে আরো কিছু কথা ঃ

এ ব্যাপারে সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং অধিকাংশ উম্মাত একমত যে, পরকালে জান্নাতবাসী ও সাধারণ মুমিনগণ মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভে ধন্য হবেন। বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত। সুতরাং এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহকে দেখা মূলতঃ কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়।

---

২৪. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আননাজম এর ১৪নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫. শরহে আকাইদে নাসাফী, মিরাজ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

তবে দুনিয়ার হায়াতে মহান আল্লাহকে দেখার মতো দৃষ্টি শক্তি কাউকে দেয়া হয়নি। পরকালের ব্যাপারে আল কুরআন ঘোষণা করেছে "فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد" অর্থাৎ আখিরাতে মানুষের দৃষ্টি শক্তি প্রখর ও শক্তিশালী করে দেয়া হবে এবং পর্দা উন্মোচিত করে দেয়া হবে। এ কারণে ইমাম মালিক (র) বলেছেন, দুনিয়ায় কোনো মানুষ মহান আল্লাহকে দেখতে পারবেনা। কারণ এখানের দৃষ্টিশক্তি ধ্বংসশীল বা فانى আর মহান আল্লাহ হচ্ছেন باقى বা চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

আখিরাতের জীবনে যখন মানুষকে فانى এর বিপরীতে স্থায়ী বা باقى দৃষ্টি শক্তি দান করা হবে, তখন মহান আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে আর কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে সম্ভবত এ বিষয়ের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। বর্ণনাটি হলো এই যে, واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا অর্থাৎ তোমরা মৃত্যুবরণ করার পূর্বে কিছুতেই তোমাদের মহা প্রভুকে দেখতে পারবে না। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৩)

আল্লামা হাফিয ইবনে কাসীর (র) আয়াতগুলোর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, হযরত ইবনুল আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) মহান আল্লাহকে দেখেছেন, এ কথা বলেছেন। আর সালফে সালেহীনদের একটি দল এ ব্যাপারে তাঁকে অনুসরণ করেছেন। পক্ষান্তরে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বিশাল জামায়াত তাঁর সাথে একমত নন। সকলের প্রমাণাদিই ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে হাফিয (র) ফাতহুল বারীতে সূরা আন নাজমের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতপার্থক্যের কথা আলোচনার পর এমন কিছু যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যা দ্বারা বিরোধপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে একটা সমাঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভব। এ প্রসঙ্গে তিনি ইমাম কুরতুবীর কথা উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম কুরতুবী তাঁর "مفهم" মুফহিম গ্রন্থে এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন যে, এ বিষয়ে আমরা চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং চুপ থাকাই শ্রেয় হবে। কেননা উক্ত মাসআলাটি আমাদের কোনো আমলের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যার কারণে আমরা এর কোনো একটা দিক চূড়ান্ত হিসেবে মেনে নিয়ে আমল করতে হবে, এমনটা জরুরী নয়। বরং এটি নিতান্তই একটি আকীদা বা বিশ্বাসগত মাসআলা। অকাট্য কোনো দলীলের ভিত্তিতে যদি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হয়, তবে এ ক্ষেত্রে চুপ-চাপ থাকাই সমীচীন হবে। (ফাতহুল বারী, ৮/৪৯৪) মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব তাঁর মাআরিফুল

www.amarboi.org

কুরআনে সিদ্ধান্ত মূলতবী রাখার বিষয়টিকেই বেশি ভালো ও নিরাপদ বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২৬] والله سبحانه وتعالى اعلم মহান আল্লাহ পাকই সবকিছু ভালো জানেন।

মি'রাজের রাত্রে মহানবী (সা)-এর দেখা কিছু দৃশ্য

এ সময়ে প্রিয় নবী (সা)-এর شق صدر বা সিনা সাক করার ঘটনা ঘটে এবং তাঁকে বিভিন্ন জিনিস দেখানো হয়েছিলো।

তাঁকে দুধ এবং মদ পরিবেশন করা হয়েছিলো। তিনি দুধ গ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি فطرة অর্থাৎ ইসলামের পথই বেছে নিয়েছেন। যদি আপনি মদ গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মাত পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো।

তিনি জান্নাতের ভেতর চারটি নহর দেখেছেন। ২টি জাহেরী, ২টি বাতেনী। জাহেরী ২টি নহর হচ্ছে ঃ নীল এবং ফোরাত। এর তাৎপর্য হলো এই যে, তাঁর রিসালাত নীল এবং ফোরাতের সজীব এলাকাসমূহে বিস্তার লাভ করবে। অর্থাৎ এখানকার অধিবাসীরা বংশপরম্পরায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করবেন। এর অর্থ এ নয় যে, এ দু'টো নহরের পানির ঝর্ণাধারা জান্নাত থেকে উৎসারিত।

তিনি আরো দেখেছেন مالك خازن النار অর্থাৎ জাহান্নামের দ্বাররক্ষী ফেরেশতাকে। তিনি কখনো হাসেন না। এমনকি তাঁর চেহারাতে হাসি-খুশীর বিন্দুমাত্র ঝলকও নেই। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টাই দেখেছেন।

ইয়াতীমের ধনসম্পদ যারা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, নবী (সা) তাদের অবস্থাও দেখেছেন। তাদের ঠোঁটগুলো উটের ঠোঁটের মতো। তারা নিজেদের মুখে পাথরের টুকরোর মতো অঙ্গার প্রবেশ করাচ্ছে। আর সেগুলো তাদের পেছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহর হাবীব (সা) সুদখোরদেরও দেখেছেন। তাদের পেট এতো বিশাল যে, ওরা নিজ অবস্থান থেকে নড়াচড়া করতে পারছিলো না। ফিরাউনের অনুসারীদেরকে জাহান্নামে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ওরা এসব সুদখোরদের মাড়িয়ে যাচ্ছিলো।

নবী (সা) ব্যভিচারীদেরও দেখেছেন। তাদের সম্মুখে তাজা গোশত এবং দুর্গন্ধময় পঁচা গোশত রাখা আছে। ওরা তাজা গোশত বাদ দিয়ে পঁচা গোশত খাচ্ছে।

যেসব নারী নষ্টামী করে নিজ গর্ভে অপর পুরুষের সন্তান ধারণ করেছিলো, নবী

২৬. তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, উর্দূ সংস্করণ, ৮/২০৪, ২০৫।

www.amarboi.org

(সা) তাদেরকেও দেখেছেন। ওসব মহিলার স্তনে বড় বড় আঁকটা বিঁধিয়ে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

মি'রাজ রজনীতে নবী (সা) মক্কার একটি কাফিলার আগমন ও প্রস্থান প্রত্যক্ষ করেছেন। ঐ কাফিলার একটি উট হারিয়ে গিয়েছিলো, তিনি তাদেরকে সে উটের সন্ধান দিয়েছেন। কাফিলার লোকেরা যখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলো, তখন তিনি তাদের ঢেকে রাখা পাত্র থেকে পানি পান করেছেন। এরপর পাত্রটি সে অবস্থায় রেখে দেন। মি'রাজ রজনীর পরদিন প্রত্যুষে এ ঘটনাটি তাঁর মি'রাজের ঘটনার পক্ষে একটি প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়েছিলো।[২৭]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম বলেন ঃ পরদিন সকালে নবী করীম (সা) রাত্রের ঘটনার বর্ণনা দিলেন। মহান আল্লাহ রাত্রিবেলা তাঁকে তাঁর যে বিশাল কুদরাতের নিদর্শনাবলী দেখিয়েছেন, নিজের কাওম তথা মক্কাবাসীদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন। কিন্তু কাফির কুরাইশরা তা বিশ্বাস করলো না, বরঞ্চ এতে তাদের অবিশ্বাস, প্রত্যাখ্যান ও নির্যাতনের মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ হলো। এক পর্যায়ে তারা বাইতুল মাকদিছের ব্যাপারে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো। মহান আল্লাহ সম্পূর্ণ বাইতুল মাকদিছের চিত্র তাঁর নবীর সামনে উপস্থাপন করলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখে দেখে তাদেরকে আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহের কথা অবহিত করতে লাগলেন। তারা নবীজীর দেয়া বাস্তব তথ্য প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ পেলো না। তিনি কুরাইশদেরকে তাদের কাফিলার মক্কা অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের সংবাদও দিলেন। ঐ কাফিলা বর্তমানে কোন্ স্থানে আছে, কবে নাগাদ মক্কায় পৌছবে, সর্বাগ্রে কোন উটটি আছে ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য বলে দিলেন, যা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব ও সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও – فلم يرد هم الا نفورا وابى الظالمون الا كفورا যালিমরা প্রত্যাখ্যান করেই চললো এবং তাদের অস্বীকৃতি ও কুফরের উপরই অটল থাকলো।[২৮]

কথিত আছে যে, ঐ সময়েই মহানবী (সা) হযরত আবু বাকর (রা)-কে "الصديق" অর্থাৎ অত্যন্ত সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কেননা তিনি সে সময়ে মি'রাজের ঘটনার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যখন অন্যান্য লোকেরা তা বিশ্বাস করছিলো না।[২৯]

---

২৭. যাদুল মায়াদ, সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, ইবনে হিশাম ১/৩৯৭, ৪০২-৪০৬।

২৮. যাদুল মায়াদ ১/৪৮, সহীহ আল বুখারী ২/৬৮৪, ইবনে হিশাম ১/৪০২, ৪০৩।

২৯. ইবনে হিশাম ১/৯৯।

www.amarboi.org

আল কুরআনে মি'রাজের গুরুত্ব

এ বিশাল ও বিস্ময়কর মহাপরিভ্রমণের কারণ ও এর তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল কুরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ "لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَا" (বনীইসরাঈল ঃ ১) অর্থাৎ রাতের বেলায় আমরা তাঁর এ মহাপরিভ্রমণের ব্যবস্থা করার পেছনে মূল কারণ হচ্ছে আমরা যেন তাঁকে আমাদের কুদরাতের কিছু নিদর্শন তাঁর আপন চোখে দেখার সুব্যবস্থা করে দিতে পারি। মূলতঃ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ব্যাপারে এটিই আল্লাহর সুন্নাত। তাই মহান আল্লাহ বলছেন ঃ وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ (সূরা আল আন'আম ঃ ৭৫) এবং এভাবেই আমরা ইব্রাহীম (আ)-কে আসমান ও যমীনের মালাকুতী ব্যবস্থাপনা দেখিয়েছি। যাতে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ)-এর ব্যাপারে বলেন ঃ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيَاتِنَا الْكُبْرٰى" (সূরা তাহা ঃ ২৩) এতে আমরা তোমাকে আমাদের বিশাল কুদরাতের নিদর্শনাদি দেখাবো। মহান আল্লাহ তাঁর এ ইচ্ছার উদ্দেশ্যও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। "وليكون من الموقنين" অর্থাৎ তাঁরা যেন দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। নবীগণ মহান আল্লাহর কুদরাতের নিদর্শনাদি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করার পর তাঁদের অন্তরে عين اليقين বা দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হয়ে যায় যার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ কোনো জিনিস না দেখে শুধু খবর শুনে বিশ্বাস করা, আর সেটা নিজ চোখে দেখে বিশ্বাস করা এক রকম নয়। নবীগণ আল্লাহর কুদরাত সরাসরি প্রত্যক্ষ করার কারণে তাঁরা যেভাবে অকাতরে যুল্‌ম-নির্যাতন, নিষ্পেষণ সহ্য করতে পারেন এবং আল্লাহর রাহে যেভাবে তাঁরা কুরবানী দিতে পারেন, অন্যরা তা পারে না। কারণ দুনিয়ার সকল শক্তি তাঁদের সামনে মাছির একটা ডানার মতোই তুচ্ছ মনে হয়।[৩০]

আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী তাঁর অনন্য সীরাত গ্রন্থ আররাহীকুল মাখতুমে সংক্ষিপ্তাকারে মহানবীর এ বিস্ময়কর পরিভ্রমণের হিকমাত ও রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মহান আল্লাহ আল কুরআনের সূরা "আল ইসরা" এর একটি মাত্র আয়াতে মি'রাজের ঘটনা উল্লেখ করেই ইহুদীদের দুষ্কৃতি ও পাপাচারের কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর তাদেরকে জানিয়েছেন যে, ان هذا القران يهدى للتى هى اقوم "নিঃসন্দেহে এ কুরআন সে পথেরই হিদায়াত দিয়ে থাকে, যে পথ সঠিক এবং সরল।" আল

৩০. আররাহীকুল মাখতুম, আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, পৃ. ১৫৯।

www.amarboi.org

কুরআন তিলাওয়াতকারীদের মনে হতে পারে যে, উভয় কথা সম্পর্কহীন, কিন্তু আসলে তা নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বর্ণনাভঙ্গীতে এ ইশারাই দিয়েছেন যে, ইসরা প্রথমত বাইতুল মাকদিছ পর্যন্ত এ জন্য করানো হয়েছে যে, অচিরেই ইহুদীদেরকে মানবজাতির নেতৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। কেননা ওরা এমনসব ভয়াবহ অপরাধ করেছে যে, নেতৃত্বের যোগ্যতা তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। কাজেই এ দায়িত্ব ও মর্যাদা এখন থেকে মহানবী (সা)-কে প্রদান করা হবে এবং দাওয়াতে ইব্রাহীমের উভয় কেন্দ্রকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন করা হবে। আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব এক উম্মাত থেকে অন্য উম্মাতের নিকট স্থানান্তর করার উপযুক্ত সময় সমাগত। যুল্‌ম, অত্যাচার, খিয়ানত, বিশ্বাসঘাতকতা, সীমালঙ্ঘনের মতো মারাত্মক অপরাধে অপরাধী ও কলঙ্কিত ইতিহাসের অধিকারী এক উম্মাতের কাছ থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে এমন একটি উম্মাতকে দেয়া হবে, যাদের মাধ্যমে কল্যাণের ঝর্ণাধারা উৎসারিত হবে। এ উম্মাতের রাসূল (সা) সরাসরি ওহীর মাধ্যমে আল কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ করছেন, যে আল কুরআন মানব জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছে।

কিন্তু এ নেতৃত্ব কিভাবে স্থানান্তরিত হবে, অথচ ইসলামের নবীতো এখনো প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় রয়েছেন এ প্রশ্নটি অন্য একটি সত্যের পর্দা উন্মোচন করছে। সেটা হলো ইসলামের দাওয়াত একটা পর্যায় অতিক্রম করার কাছাকাছি, অচিরেই আর একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এ অধ্যায়টি হবে পূর্বের চেয়ে ভিন্নতর। এ কারণে দেখা যায় যে, কোনো কোনো আয়াতে পৌত্তলিকদের সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং কঠোর ভাষায় হুমকি দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন সেখানকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে নির্দেশ দেই, তারা সেখানে পাপাচারে লিপ্ত হয়। এতে তারা শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়, আর অমনি আমি সে জনপদ ধ্বংস করে দেই। وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح ـ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ـ নূহের পর আমরা বহু মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করে দিয়েছি। আপনার রবই তাঁর বান্দাহদের পাপাচারের খবর রাখা এবং তাদের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ১৭)

এর পাশাপাশি রয়েছে এমন অনেক আয়াত যেগুলো সভ্যতা ও তার নিয়ম-পদ্ধতি, যার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নবাগত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা– এর নিখুঁত একটি রূপ-রেখা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে। এতে এ আভাস পাওয়া যাচ্ছে

www.amarboi.org

যে, খুব শীঘ্রই রাসূলুল্লাহ (সা) একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল আবাসভূমির কর্ণধার হতে যাচ্ছেন যা তাঁর নির্দেশ মুতাবিক নিয়ন্ত্রিত হবে এবং পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে তাঁর দাওয়াতী মিশন পরিচালনার জন্য এ নিরাপদ স্থানটি কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করবে।

এ বিস্ময়কর মহাপরিভ্রমণের গুরুত্ব ও রহস্যাবলীর মধ্যে এ হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র অংশ।[৩১]

মি'রাজের ঘটনা বর্ণনাকারী সাহাবীগণ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আল কুরআনে মহানবী (সা)-এর বাইতুল মাকদিছ পর্যন্ত ভ্রমণের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। মহা ভ্রমণের বাকী অংশ হাদীস শরীফ থেকে বিস্তারিত জানা যায়। এত অধিক সংখ্যক সাহাবী থেকে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন ঘটনার ব্যাপারে যার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ মি'রাজের ঘটনা বর্ণনাকারী রাবীর সংখ্যা অর্ধশত পর্যন্ত বলেছেন।[৩২]

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, ইসরার হাদীসসমূহ সবই মুতাওয়াতির পর্যায়ের। নাককাশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। কাজী আয়ায শিফা গ্রন্থে আরো বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

আল্লামা হাফিয ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এসব বর্ণনা যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। তিনি পঁচিশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন ঃ (১) উমার ইবনুল খাত্তাব, (২) আলী, (৩) ইবনে মাসউদ, (৪) আবু যার আল গিফারী, (৫) মালিক ইবনে ছা'ছা, (৬) আবু হুরাইরা, (৭) আবু সাঈদ, (৮) ইবনুল আব্বাস, (৯) শাদ্দাদ ইবনে আউস, (১০) উবাই ইবনে কা'ব, (১১) আবদুর রহমান ইবনে কুর্য, (১২) আবু হাইয়্যা, (১৩) আবু লাইলা, (১৪) আবদুল্লাহ ইবনে উমার, (১৫) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, (১৬) হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, (১৭) বুরাইদা, (১৮) আবু আইয়ূব আলআনসারী, (১৯) আবু উমামা, (২০) সামূরা ইবনে জুনদুব, (২১) আবুল হামরা, (২২) সুহাইব রুমী, (২৩) উম্মুহানী, (২৪) আয়িশা, (২৫) আসমা বিনতে আবু বাকর (রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন)।

এরপর আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন ঃ فحديث الاسراء اجمع عليه

৩১. আররাহীকুল মাখতুম, আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, পৃ. ১৫৭, ১৬০, আরবি সংস্করণ।

৩২. হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর (পি, এইচ, ডি, রিয়াদ) পৃ. ২৭২।

www.amarboi.org

المسلمون واعرض عنه الزنادقة والملحدون মি'রাজের ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে সকল মুসলিমের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দিকরা এটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

মি'রাজ দৈহিক হয়েছিলো নাকি আত্মিক

এ সফরের রূপটা কী ছিলো? এটা কি স্বপ্নে সংঘটিত হয়েছিলো, নাকি জাগ্রত অবস্থায়? নবী (সা) স্বয়ং গিয়েছিলেন, না তিনি নিজ স্থানে থেকে কেবল আত্মিকভাবেই এসব কিছু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন? আল কুরআনে উদ্ধৃত শব্দ ও ভাষা থেকেই এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। আল কুরআনে ঘটনার শুরু হয়েছে سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى দ্বারা। এভাবে এ ভাষায় বর্ণনা আরম্ভ করার কারণে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, এটি এক অতীব বড় ও অস্বাভাবিক ঘটনা ছিলো, যা আল্লাহপাকের অসীম কুদরাতের ফলে সংঘটিত হয়েছে। স্বপ্নে কারো এরূপ দেখা বা কাশফের মাধ্যমে দেখা এমন কোনো গুরুতর ব্যাপার নয় যে, এ প্রসঙ্গ বর্ণনার সূচনা এ ভাষায় করতে হবে "সে মহান আল্লাহ যাবতীয় দুর্বলতা ও অক্ষমতা থেকে পবিত্র যিনি স্বীয় বান্দাহকে এ স্বপ্ন দেখিয়েছেন বা কাশফ যোগে এসব দেখিয়েছেন।" এরপর এক রাতে নিজ বান্দাহকে নিয়ে গেলেন" এ শব্দ ও ভাষণ হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সফর শারীরিক ভাবেই হয়েছিলো। স্বপ্নযোগে যাওয়া কিংবা কাশফ যোগে কোনো পরিভ্রমণ করার বর্ণনার জন্য এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ কখনো স্বাভাবিক হতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দিয়ে যা করিয়েছেন, তা নিছক কোন আধ্যাত্মিক ব্যাপার ছিলো না। ছিলো সশরীরে গমন ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এ কথা অসংকোচে মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এক রাতে হাওয়াই জাহাজ বা রকেট ব্যতীতই মাসজিদে হারাম থেকে বাইতুল মাকদিছ পর্যন্ত যাতায়াত করা মহান আল্লাহর কুদরাতের পক্ষে যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তবে হাদীসে বর্ণিত পরবর্তী বিবরণকে অসম্ভব বলে প্রত্যাখ্যান করা কিভাবে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? "সম্ভব-অসম্ভব" এ প্রশ্নতো কেবল তখনই হতে পারে, যখন কোনো মাখলুকের নিজের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে কিছু একটা করার ব্যাপার আসবে। কিন্তু যদি বলা হয় যে, এ কাজ মহান আল্লাহ করেছেন, তা হলে সে সময় সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন সেই তুলতে পারে, মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ ও সর্বক্ষমতার মালিক হওয়া সম্পর্কে যার দৃঢ় বিশ্বাস নেই।

মি'রাজের ঘটনাটি যদি স্বপ্নের ঘটনা হতো, রাসূলুল্লাহ (সা) পরদিন সকালে

www.amarboi.org

মক্কাবাসীদের নিকট এটিকে স্বপ্নের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করতেন। আর মক্কার লোকজন তাই বুঝতো, তা হলে মক্কার কাফিররা একে অসম্ভব মনে করে উড়িয়ে দেয়ার, এ নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন তোলার, হৈ-চৈ করার, এমনকি এতে কতিপয় মুসলিমেরও ঈমান নড়বড় হয়ে যাওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতো না।

বাইতুল মাকদিছে যাত্রা বিরতির পর মি'রাজের পরবর্তী বিস্তারিত বিবরণ, যা হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা কুরআনের বর্ণনার বিপরীত কিছু নয়। বরং হাদীসের বর্ণনা আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পরিপূরক। এতদসত্ত্বেও হাদীসে বর্ণিত এ বাড়তি বিস্তারিত বর্ণনার কোন অংশ যদি কেউ সত্য বলে মেনে না নেয়, তবে তাকে এ জন্য কাফির বলা যাবে না। অবশ্য আল কুরআন যে মূল ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ করেছে, তা কেউ অমান্য করলে সে অবশ্যই কাফির বলে গণ্য হবে।[৩৩]

উল্লেখ্য যে, মি'রাজ স্বপ্নে হয়েছিলো নাকি বাস্তবে এটি একটি আকীদাগত মাছআলা। বিখ্যাত আকাইদ গ্রন্থ "শরহে আকাইদে নাসাফী"তে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَالْمِعْرَاجُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِى الْيَقْظَةِ بِشَخْصِهِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اِلٰى مَا شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْعُلٰى حَقٌّ.

অর্থাৎ, আসমান এবং তদূর্ধ জগতে মহান আল্লাহর মঞ্জুর মুতাবিক তাঁর রাসূল (সা)-এর সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় তাঁর মি'রাজের ঘটনা সত্য এবং বাস্তব এবং তা গ্রহণযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[৩৪]

মি'রাজকে ঘিরে প্রচলিত জাল হাদীস

মি'রাজকে ঘিরে বহু সংখ্যক আজগুবী গল্প, কিচ্ছা-কাহিনী বা বানোয়াট কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। অথচ মি'রাজ অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত একটি অলৌকিক ঘটনা। এ বিশাল ঘটনাটি সহীহ সুন্নায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। একজন মুমিনের জন্য এতে রয়েছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। এতদসত্ত্বেও ওসব বানোয়াাট কথা দিয়ে মি'রাজের ঘটনাকে কৃত্রিমভাবে সাজানোর মধ্যে দীনী কোন্ প্রয়োজন নেই।

---

৩৩. তাফহীমুল কুরআন, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মাওদূদী, সূরা বনী ইস্রাঈল, ১নং ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৩৪. শরহে আকাইদে নাসাফী, মিরাজ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্দালুভী তাঁর ফাযায়েলে নামায গ্রন্থে নামায তরককারীর শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

من ترك الصلوة حتى مضى وقتها ثم قضى عذب فى النار حقبا - والحقب ثمانون سنة - والسنة ثلاثمائة وستون يوما - كل يوم مقداره الف سنة -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করলো না এবং এরপর সে ঐ নামায কাযা করলো, তাকে জাহান্নামে এক হুকবা শাস্তি প্রদান করা হবে। এক হুকবা সমান ৮০ বছর এবং এক বছর সমান ৩৬৫ দিন এবং (জাহান্নামের) একদিন সমান দুনিয়ার এক হাজার বছর।" এর মানে হলো এক ওয়াক্ত নামায তরককারীকে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বছর জাহান্নামের আগুনে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হাদীসটি উদ্ধৃত করে মাওলানা যাকারিয়া সাহেব নিজেই বলেন ঃ

كذا فى مجالس الابرار قلت : لم اجده فيما عندى من كتب الحديث ...

"মাজালিছুল আবরার নামক গ্রন্থে এভাবে লেখা হয়েছে। আমি বলছি যে, আমার নিকট যতগুলো হাদীস গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোর কোনোটিতেই আমি এ হাদীসটি পাইনি।"[৩৫]

মাওলানা যাকারিয়া সাহেব যেখানে নিজেই বললেন যে, তিনি কোনো হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি খুঁজে পাননি, সেখানে তিনি নিজেই এ হাদীসটি নামায তরককারীর শাস্তির দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে এ হাদীসটি একটি ভিত্তিহীন, সনদবিহীন মাওজু বা বানোয়াট হাদীস। মহানবী (সা)-এর সতর্কবাণীগুলোর প্রতি এসব আলিম ও বুজুর্গ ব্যক্তি একবারও কি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি। হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলেছেন ঃ

اياكم وكثرة الحديث عنى فمن قال عنى فليقل حقا وصدقا (فلا يقل الا حقا) ومن تقول (قال) عَلَىَّ مالم اقل فليتبوأ مقعده من النار -

"সাবধান! তোমরা আমার নামে বেশি বেশি হাদীস বলা থেকে বিরত থাকবে। যে

৩৫. শাইখুল হাদীস মাও ঃ যাকারিয়া সাহেব কান্দালুভী, ফাযায়েলে নামায, পৃ. ৫৭, ৫৮।

www.amarboi.org

আমার নামে কিছু বলবে সে যেন সঠিক ও সত্য কথা বলে। আর যে আমার নামে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বেছে নেয়।"[৩৬] নবী করীম (সা) আরো বলেন ঃ من يقل مالم اقل فليتبوأ مقعده من النار- অর্থাৎ "আমি যে কথা বলিনি এমন কথা যে আমার নামে বলবে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।"[৩৭]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এসব সতর্কবাণীর প্রতি তাঁর অনুসারীগণ গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করার সময় দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে কখনো একটি শব্দ পর্যন্ত নিজেদের পক্ষ থেকে সংযোজন করেননি। সমার্থবোধক কোনো শব্দের ব্যাপারেও তাঁদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে "او" শব্দ বলে তাও প্রকাশ করে দিয়েছেন। এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত হাদীস গ্রন্থে বিদ্যমান।

এতদসত্ত্বেও আমাদের সমাজের বেশ কিছু লোক এ দিকে ভ্রূক্ষেপই করেন না। মি'রাজের অকাট্য ঘটনাটিতেও তারা বানোয়াট কল্প-কাহিনী ও জাল হাদীসের কালিমা লেপন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি।

এ প্রসঙ্গে একটি অতি প্রচলিত ভিত্তিহীন হাদীসের দৃষ্টান্ত ঃ "الصلوة معراج المؤمنين" অর্থাৎ "নামায হলো মুমিনদের মি'রাজ।"[৩৮] এটি সনদবিহীন বহুল প্রচলিত একটি জাল হাদীস। বহু সংখ্যক সহীহ হাদীসে নামাযের গুরুত্ব, নামাযের ফযীলত, সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ হওয়া সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ নবীজির পবিত্র জবান থেকে সরাসরি শ্রবণ করে তাঁর অনুসারীগণ পরবর্তী প্রজন্মের নিকট যত্ন-সহকারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সেগুলো তাঁদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন সনদের বর্ণনা সহকারে। মুমিনের জন্যে এটাইতো যথেষ্ট।

মি'রাজ রজনীতে ৩০ হাজার বাতিনী ইলম বিষয়ক জাল হাদীস

বাতিনী ইলম বিষয়ক একটি জঘন্য মিথ্যা কথা হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর নামে প্রচলিত "সিররুল আসরার" নামক পুস্তকে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "এই একান্ত গুপ্ত ত্রিশ হাজার ইলম মি'রাজের রাতে আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-এর কলব মুবারকে আমানত রাখেন। নবী (সা) তাঁর অত্যধিক প্রিয়

---

৩৬. সুনানে ইবনে মাজা ১/১৪, সুনানে দারিমী (২৫৫ হি.) ১/৮২। মুসতাদরাকে হাকীম ১/১৯৪।
৩৭. সহীহ আল বুখারী ১/৫২।
৩৮. মুফতী হাবীব ছামদানী, বার চান্দের ফযীলত, পৃ. ১২৩।

www.amarboi.org

সাহাবী এবং আসহাবে সুফফা ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ লোকের নিকট সেই পবিত্র আমানত ব্যক্ত করেননি।[৩৯]

এটি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে জঘন্য মিথ্যা কথা। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোনো সাহাবী বা আহলে সুফফার কারো থেকে এ ধরনের কোনো কথা সহীহ বা জয়ীফ সনদে কোথাও বর্ণিত হয়নি।[৪০]

মি'রাজ রজনীতে জুতা পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আরশে আরোহণ সংক্রান্ত জাল হাদীস

মি'রাজ প্রসঙ্গে আমাদের সমাজে অতি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ একটি জাল হাদীস হলো ঃ

"মি'রাজ রজনীতে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তিনি আরশে মুয়াল্লায় পৌছলেন, তখন তিনি তাঁর পায়ের জুতা দুটো খুলবার ইচ্ছা করলেন একথা স্মরণ করে যে, মহান আল্লাহ ইতিপূর্বে হযরত মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ "فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى" হে মূসা! তুমি তোমার পাদুকায়দ্বয় খুলে ফেল। তুমিতো পবিত্র "তুয়া" প্রান্তরে রয়েছো।"[৪১] তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবান করে বলা হলো ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার জুতাদ্বয় খুলবেন না। কারণ জুতাদ্বয়সহ আপনার আগমনে আরশ মর্যাদাবান হবে এবং অন্যদের ওপর বরকতের অহংকার করবে। তখন নবী করীম (সা) জুতাদ্বয় পায়ে রেখেই আরশে আরোহণ করেন।"

এ কাহিনীর আগাগোড়া সবটুকুই মিথ্যা। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ কাহিনী সম্পর্কে বরাবরই বলে আসছেন যে, এ কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, আমাদের দেশে কিছু লোক এসব মিথ্যা কাহিনী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে নির্বিচারে বলে যাচ্ছেন, লিখে যাচ্ছেন। আল্লামা রফিউদ্দিন কাযবিনী, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল মাক্কারী, যারকানী, আবদুল হাই লাখনবী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ কাহিনীর জালিয়াতি ও মিথ্যাচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ এ ঘটনা যে জালিয়াত বানিয়েছে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন। রাসূলুল্লাহ

৩৯. সিররুল আসরার, পৃ. ৪৫।

৪০. হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃ. ৩৪৮।

৪১. সূরা ত্বা হা, আয়াত ১২।

www.amarboi.org

(সা)-এর মি'রাজের ঘটনায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশি। এর একটি বর্ণনায়ও আসেনি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মি'রাজের সময় জুতা পরে ছিলেন। এমনকি এ কথাও কোনো বর্ণনায় আসেনি যে, তিনি মি'রাজ রজনীতে পবিত্র আরশে আরোহণ করেছিলেন।[৪২]

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল বাকী যারকানী (১১২২ হি) "আল মাওয়াহিব আল লাদুন্যিয়া" গ্রন্থের ব্যাখ্যা" শরহুল মাওয়াহিব" গ্রন্থে আল্লামা রাযী কাযবিনীর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এতে মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (সা) সিদরাতুল মুনতাহা" অতিক্রম করেননি একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে আরো বলা হয়েছে ঃ

ولم يرد فى خبر ثابت ولا ضعيف انه رقى العرش ـ وافتراء بعضهم لا يلتفت اليه ـ

অর্থাৎ "একটি সহীহ অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয়নি যে, তিনি আরশে আরোহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে বাজে লোকদের মিথ্যাচারের প্রতি লক্ষ্য করার প্রয়োজন নেই।"[৪৩]

মূলতঃ মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাফরাফে আরোহণ করা এবং আরশে গমন করা সংক্রান্ত কোনো কথা হাদীসের ৬টি বিশুদ্ধ গ্রন্থসহ মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক (র) অথবা অন্য কোনো প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে নেই। ৫/৬ শত বছর পর্যন্ত সংকলিত গ্রহণযোগ্য কোনো ইতিহাস বা সীরাত গ্রন্থেও এ বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। দশম হিজরী শতাব্দী ও এর পরবর্তী যুগে সংকলিত সীরাত বিষয়ক বিভিন্ন বইতে মি'রাজের আলোচনায় রাফরাফে আরোহণ, আরশে গমন এসব কথা পাওয়া যায়।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (র)-এর অভিমত হলো যে সকল হাদীস কোনো প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে নেই বরং পঞ্চম হিজরী শতকে বা তারও পরে কোনো কোনো মুহাদ্দিস বা লেখক সেগুলো সংকলন করেছেন, সেগুলো সাধারণত বাতিল অথবা অত্যন্ত দুর্বল সনদের হাদীস। বিশেষত ১১শ-১২শ শতাব্দীর গ্রন্থাদিতে সহীহ, যয়ীফ ও মাওযূ সবকিছু একত্রে মিশ্রিত করে সংকলন করা হয়েছে।[৪৪]

---

৪২. আল আসরার, পৃ. ৩৭।

৪৩. যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব ৮/২২৩।

৪৪. হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃ. ২৭২।

www.amarboi.org

মি'রাজ রজনীতে আত তাহিয়্যাতু লাভ একটি বানোয়াট কাহিনী

আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত একটি কথা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) মি'রাজ রজনীতে আত তাহিয়্যাতু লাভ করেন। এ বিষয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটির সার সংক্ষেপ হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) মি'রাজের রাত্রিতে যখন মহান আল্লাহর সর্বোচ্চ নৈকট্যে পৌঁছেন, তখন তিনি মহান আল্লাহকে সম্বোধন করে বলেন "التحيات لله والصلوة والطيبات" মহান আল্লাহ এর জবাবে বলেন "السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته" তখন রাসূলুল্লাহ (সা) চান যে, তাঁর উম্মাতের জন্যেও সালামের অংশ থাকুক। এ জন্যে তিনি বলেন "السلام علينا وعلى عباد الله الصلحين" তখন জিব্রাঈল (আ) সহ সকল আকাশবাসী বলেন "اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله" কোনো কোনো গল্পকার বলেন "السلام علينا وعلى عباد الله الصلحين" বাক্যটি ফেরেশতাগণ বলেছিলেন।

এগুলোর কোনো ভিত্তি আছে বলে জানা যায়নি। কোনো হাদীস গ্রন্থে সনদসহ এ ধরনের কোনো বর্ণনা আসেনি। সনদবিহীনভাবে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য সকল হাদীস গ্রন্থে التحيات বা تشهد বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এটি মি'রাজ থেকে এসেছে।

মুহূর্তের মধ্যে মি'রাজের সকল ঘটনা সংঘটিত হওয়া সংক্রান্ত আজব গল্প

মি'রাজের ঘটনা প্রসঙ্গে আরো একটি আজব গল্প আমাদের সমাজে, বহুলভাবে প্রচলিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মি'রাজের সম্পূর্ণ ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যায়। তিনি মি'রাজ থেকে ফিরে এসে দেখেন পানি গড়াচ্ছে। শিকল নড়ছে, বিছানা গরম রয়েছে ইত্যাদি। এসবই হচ্ছে ভিত্তিহীন আজব গল্প। হাদীস গ্রন্থগুলোতে মি'রাজের ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ ধরনের কোনো বর্ণনার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আত তাবারানী সংকলিত একটি হাদীসে এ বর্ণনাটি এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

ثم اتيت اصحابى قبل الصبح بمكة فاتانى ابو بكر فقال يارسول الله اين كنت الليلة فقد التمستك فى مكانك فلم اجدك ـ

www.amarboi.org

"অতঃপর প্রভাতের পূর্বে আমি মক্কায় আমার সাহাবীদের নিকট ফিরে আসলাম। তখন আবু বাকর আমার নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সা) আপনি গত রাত্রে কোথায় ছিলেন? আমি আপনার স্থানে আপনাকে তালাশ করেছিলাম, কিন্তু আপনার কোনো সন্ধান পাইনি। তখন তিনি মি'রাজের ঘটনা বললেন। হাদীসটির সনদের একজন রাবীকে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং কেউ কেউ দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম রাত্রে মি'রাজে গমন করেন এবং শেষ রাত্রে ফিরে আসেন। সারা রাত্র তিনি মক্কায় অনুপস্থিত ছিলেন। এরূপ আরো ২/১টি হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মি'রাজে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা) রাতের কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন।[৪৫]

মি'রাজের ঘটনা একটি বিশাল অলৌকিক ঘটনা। এতে সময়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। এটি আল্লাহ তা'আলার কুদরাতের বিষয়। তিনি তাঁর নবীকে দিয়ে এ বিশাল ঘটনা এক রাতের মধ্যে সম্পাদন করিয়েছেন, এটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল কুরআনের "لنريه من اياتنا" অর্থাৎ "যেন আমরা তাঁকে আমাদের কুদরাতের নিদর্শনাবলী দেখাতে পারি।" এ কথা এবং সহীহ হাদীস সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় এ ঘটনা সম্পাদনের জন্যে এক রাত নয়, বরং অসংখ্য রাতের প্রয়োজন; কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরাতে অসংখ্য বছরের ঘটনাও এক মুহূর্তে ঘটানো সম্ভব।

এখানে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আল কুরআন ও সহীহ হাদীসে যা বর্ণিত হয়নি, আল্লাহ ও রাসূলের নামে তা না বলা। কেউ যদি কোনো ঘটনার প্রতি গুরুত্বারোপ করে উদাহরণ পেশ করতে চায়, তবে আল কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকেই তা পেশ করা সম্ভব।

সূরা আল বাকারার ২৫৯ নং আয়াতে এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত মাওজুদ আছে–

اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ج قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ

৪৫. মাজমাউদ যাওয়াইদ ১/৭৫, ৭৬, আল মাতালিব লি ইবনে হাজার ৪/৩৮১।

www.amarboi.org

عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ لا قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

"অথবা উদাহরণস্বরূপ সে ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা কর, যে এমন একটি জনপদে গিয়ে পৌছালো, যা উপুড় হয়ে পড়েছিলো, । সে বলল ঃ এ জনপদ, যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে, একে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে পুনরুজ্জীবিত করবেন? অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে আকস্মিকভাবে মৃত্যু দান করলেন এবং সে একশ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে থাকলো। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন এবং প্রশ্ন করলেন ঃ বলতো কত সময় তুমি অবস্থান করছিলে? সে জবাবে বললো, একদিন অথবা তার কিয়দংশ মাত্র। মহান আল্লাহ বললেন ঃ তুমি একশত বৎসর এভাবে অবস্থান করছিলে। তাকিয়ে দেখ তোমার খাদ্য ও পানীয় এর দিকে। (মহান আল্লাহর কুদরাতে একশ বছরে) তার মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসেনি। অন্যদিকে একবার তোমার (সওয়ারী) গাধাটার দিকেও তাকিয়ে দেখ (তা জীর্ণ হয়ে গিয়েছে)। আর আমরা এ অলৌকিক ঘটনা এ জন্য ঘটিয়েছি যে, আমরা তোমাকে জনগণের জন্যে একটি নিদর্শন বানাতে চাই। এরপর তাকিয়ে দেখ, হাড়গোড়ের এ পাঁজরকে উঠিয়ে আমরা কিভাবে গোশত ও চামড়া দ্বারা ভরে দিচ্ছি। এভাবে মহান আল্লাহর কুদরাত বা অসীম ক্ষমতা যখন তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান।"

মহান আল্লাহ তাঁর আপন কুদরাতে কোনো অলৌকিক কাজ সম্পাদন করার বিষয়টি যে আমাদের হিসেবের আওতা বহির্ভূত তার আরো একটি দৃষ্টান্ত আমরা আল কুরআনের সূরা আন নামল থেকে গ্রহণ করতে পারি ঃ

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ـ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ ـ قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ

www.amarboi.org

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ط فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ قف لِيَبْلُوَنِىْ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ط وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ.

"সুলাইমান (আ) বললেন ঃ হে সভাসদবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে কে তার (সাবার সম্রাজ্ঞীর) সিংহাসন খানি আমার সামনে এনে দিতে পারে, আমার অনুগত হয়ে আমার নিকট তাদের উপস্থিত হবার পূর্বে? এক বিরাটকায় জ্বিন নিবেদন করল, আপনার এ মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে আমি আপনার নিকট তা নিয়ে আসতে পারব। এ কাজ করার ক্ষমতা আমার আছে, আর সে সঙ্গে আমি বিশ্বস্ত আমানতদারও বটে। কিতাবের জ্ঞানসমৃদ্ধ এক ব্যক্তি বলল, আপনার চোখের পলকের মধ্যেই আমি ঐ সিংহাসন (সাবার রাজধানী মারীব থেকে) আপনার নিকট নিয়ে আসতে সক্ষম। এরপর যখনই সুলাইমান (আ) সে সিংহাসনটি নিজের নিকট রাখা দেখতে পেলেন, অমনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, এটি আমার রব এর অনুগ্রহ, যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি এ নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা আদায় করি, না কি অকৃতজ্ঞ থাকি। আর যে শোকর করে, তার শোকর তার নিজের জন্যেই মঙ্গলজনক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে না শোকর করে, তবে আমার রব মুখাপেক্ষীহীন, স্বতই মহান।" উল্লেখ্য যে, হযরত সুলাইমান (আ)-এর দরবার থেকে সাবার সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন পর্যন্ত দীর্ঘ পথের দূরত্ব পাখির উড্ডয়ন হিসেবেও অন্তত দেড় হাজার মাইল ছিল। হযরত সুলাইমান (আ) এর দরবার সর্বোচ্চ ৩/৪ ঘণ্টার জন্যে স্থায়ী হত। এত দূর থেকে সম্রাজ্ঞীর বিরাট মূল্যবান সিংহাসন এত অল্প সময়ের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে আসা বর্তমান কালের হেলিকপ্টার অথবা দ্রুতগামী জেট বিমানের পক্ষেও সম্ভব নয়। (বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)। সূরা আননামলের তাফসীর।)

রাসূলুল্লাহ (সা) মি'রাজ থেকে ফিরে আসেন, কিন্তু তাঁর বিছানা তখনো গরম রয়েছে ইত্যাদি ভিত্তিহীন কথা। বিখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনুস সায়্যিদ দরবেশ হুত (১২৭৬ হিঃ) এ বিষয়ে বলেন ঃ

ذهابه ورجوعه ليلة الاسراء ولم يبرد فراشه لم يثبت ذلك

www.amarboi.org

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) মি'রাজের রাত্রিতে গমন করেন এবং ফিরে আসেন। কিন্তু তখনো তাঁর বিছানা ঠাণ্ডা হয়নি, এ কথাটির কোনো প্রমাণ নেই।[৪৬]

মি'রাজ অস্বীকারকারীর মহিলায় রূপান্তরিত হওয়ার কথিত ঘটনাটিও বানোয়াট

আমাদের সমাজের প্রচলিত আরো একটি বানোয়াট কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, মি'রাজ রজনীতে মুহূর্তের মধ্যে এতো সব ঘটনা ঘটেছিলো বলে মানতে পারেনি এক ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তি একটি মাছ ক্রয় করে তার স্ত্রীর নিকট দিয়ে নদীতে গোছল করতে যায়। পানিতে নেমে ডুব দিয়ে গোছল করার সময় সে হঠাৎ মহিলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। একজন সওদাগর তাকে নৌকায় তুলে নিয়ে যায় এবং পরে তাকে বিবাহ করে। অনেক বছর তারা উভয়ে এক সাথে ঘর সংসার করে। তাদের অনেক সন্তানাদি হয়। এ অবস্থায় একদিন সে নদীতে গোছল করতে আসলে পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে পূর্বের বাড়িতে ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী এখনো মাছ কাটার মধ্যেই মাশগুল রয়েছে। এ সবই মিথ্যা কাহিনী।[৪৭]

জাল হাদীসের ভিত্তিতে রজব মাসের মর্যাদা ও এ মাসের বিভিন্ন আকর্ষণীয় ঘটনা

রজব মাসের ঘটনা, এ মাসের বিভিন্ন গরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, এ মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সালাত, সিয়াম, দান-খয়রাত, দু'আ-মুনাজাত ইত্যাদি ইবাদাত করলে কী ধরনের অকল্পনীয় সাওয়াব ও পুরস্কার পাওয়া যাবে এ সবের বর্ণনায় বিস্তর মাওযূ হাদীস বানানো হয়েছে।

যেমন, বলা হয়ে থাকে, অন্য মাসের ওপর রজবের মর্যাদা তেমনি, যেমন সাধারণ মানুষের কথার ওপর কুরআনের মর্যাদা। এ মাসে নূহ (আ) ও তাঁর সহযাত্রীগণ নৌকায় আরোহণ করেন। এ মাসেই নৌকা পানিতে ভেসেছিল। এ মাসেই রক্ষা পেয়েছিল। এ মাসেই আদম (আ)-এর তাওবা কবুল হয়। এ মাসেই ইউনূস (আ)-এর জাতির তাওবা কবুল হয়। এ মাসেই ইব্রাহীম (আ) ও ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়। এ মাসেই মূসা (আ)-এর জন্যে সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হয়। এ মাসের প্রথম তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেন, ২৭ তারিখে মি'রাজ গমন করেন। এ মাসে সালাত, সিয়াম, দান-খয়রাত, যিকর, দরুদ, দুআ ইত্যাদি

৪৬. আসনাল মাতালিব, পৃ. ১১২।

৪৭. হাদীসের নামে জালিয়াতি. পৃ. ২৭৬।

www.amarboi.org

নেক আমল করলে এর সাওয়াব অনেক বৃদ্ধি পায়... ইত্যাদি সবই জাল হাদীস।[৪৮]

রজব মাসের বিশেষ সালাত সংক্রান্ত জাল হাদীস

রজব মাসে সাধারণভাবে এবং রজব মাসের ১ তারিখ, ১ম শুক্রবার, ৩,৪, ৫, ১৫, ২৭ তারিখ শেষ দিন ও অন্যান্য বিশেষ দিনে বা রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ সালাত আদায়ে অভাবনীয় পুরস্কারের ফিরিস্তি দিয়ে অনেক জাল ও বানোয়াট হাদীস প্রচার করা হয়েছে। আল্লামা ইবনু রজব, ইবনু হাজার আসকালানী, আস সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ একবাক্যে বলেছেন ঃ রজব মাসে বিশেষ কোনো সালাত বা রজব মাসের কোনো দিনে বা রাতে কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ সালাত আদায় করলে বিশেষ সাওয়াব পাওয়া যাবে, এ মর্মে একটি হাদীসও গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল। কেননা এ সবই বানোয়াট।[৪৯]

রজব মাসের বিশেষ সিয়াম সংক্রান্ত জাল হাদীস

সবচেয়ে বেশি জাল হাদীস প্রচলিত হয়েছে রজব মাসের বিশেষ সিয়াম পালনের বিষয়ে। মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, রজব মাসের সিয়ামের বিশেষ সাওয়াব বা রজব মাসের বিশেষ কোনো দিনে সিয়াম পালনের উৎসাহ জ্ঞাপক সকল হাদীসই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কোনো কথাই নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি।[৫০]

২৭শে রজবের রাতের ইবাদাত বিষয়ক জাল হাদীস

মি'রাজ রজনীতে ইবাদাত বন্দেগী করলে বিশেষ কোনো সাওয়াব হবে এ বিষয়ে একটিও সহীহ অথবা যয়ীফ হাদীস নেই। মি'রাজ রজনী কোনটি তাই যেখানে হাদীসে বলা হয়নি, সেখানে রাত পালনের কথা আসে কিভাবে? তবে ২৭শে

---

৪৮. আল আসার, লাখনবী পৃ. ৫৮-৯০, আল আসরার, মোল্লা আলী কারী, পৃ. ১৬৬, লাতাইফ, ইবনে রাজাব, পৃ. ১/১৯৯, তাবয়ীনুল আজাব, ইবনে হাজার, পৃ. ৯-৮০।

৪৯. লাতাইফ ১/১৯৪, আল আসরার, পৃ. ২৩৮, আল মাসনূ, পৃ. ২০৮, আল আসার, পৃ. ৫৮-৯০, ১১১-১১৩।

৫০. আল মানার, ইবনুল কাইয়্যেম পৃ. ৯৬, লাতাইফ, পৃ. ১/১৯৫-১৯৭, আল আসরার, মোল্লা আলী কারী, পৃ. ৩৩০, আল ফাওয়াইদ, শাওকানী, পৃ. ২/৫৩৯-৫৪১, কাশফুল খাফা, পৃ. ২/৫৬৭।

www.amarboi.org

রজবের দিনে এবং রাতে ইবাদাত বন্দেগীর ফযীলতের বিষয়ে কিছু জাল হাদীস প্রচলিত আছে। এসকল জাল হাদীস মি'রাজের রাত হিসেবে নয়, বরং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির দিবস হিসেবে বা একটি ফযীলতের দিন হিসেবে ২৭শে রজবকে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

"রজব মাসের মধ্যে একটি দিন আছে, কেউ যদি সে দিন রোযা রাখে এবং সে রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তাহলে সে ১০০ বছর সিয়াম পালন করার ও রাত জেগে সালাত আদায় করার সাওয়াব লাভ করবে। সে দিন হলো রজব মাসের ২৭ তারিখ। এ দিনেই মুহাম্মাদ (সা) নবুয়াত লাভ করেন। এ দিনেই সর্বপ্রথম জিব্রাঈল (আ) মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর অবতরণ করেন।"[৫১]

অন্য একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ ঃ

"যদি কেউ রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতে ১২ রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়ে, সালাত শেষ হলে সে বসা অবস্থায়ই ৭ (সাত) বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে এবং এরপর চার বার সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ালা হাওয়ালা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম বলে, এর পরদিন রোযা রাখে, তবে আল্লাহ তাঁর ৬০ বছরের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। এ রাতেই মুহাম্মাদ (সা) নবুয়াত পেয়েছিলেন।"[৫২]

অন্য একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ ঃ

"রজব মাসের ২৭ তারিখ আমি নবুয়াত পেয়েছি। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দিনে রোযা রাখবে, তা তার ৬০ মাসের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।"[৫৩]

আরো একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ইবনুল আব্বাস (রা) ২৭শে রজবের সকাল থেকে ইতিকাফ আরম্ভ করতেন। জোহর পর্যন্ত নামাযে মাশগুল থাকতেন, জোহরের পর অমুক অমুক সূরা দিয়ে চার রাকআত বিশেষ সালাত

---

৫১. যারকানী, আল আবাতীল ২/৭১৪, ইবনু হাজার, তাবয়ীনুল আজাব, পৃ. ৬৩, সুয়ূতী, যাইলুল লাআলী, পৃ. ১১৭, শাওকানী, আল ফাওয়াইদ ২/৫৩৯, আবদুল হাই লাখনবী, আল আসার, পৃ. ৫৮।

৫২. আল আসার, আঃ হাই লখনবী, পৃ. ৫৮, তাবয়ীনুল আজাব, ইবনু হাজার আসকালানী, পৃ. ৫২।

৫৩. তাবয়ীনুল আজাব, পৃ. ৬৪, তানযীহ পৃ. ২/১৬১।

www.amarboi.org

আদায় করতেন এবং আছর পর্যন্ত দু'আ তে থাকতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করতেন।[৫৪]

ইবনু হাজার আল আসকালানী, মোল্লা আলী কারী, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আজলূনী, আবদুল হাই লাখনবী, দরবেশ হুত প্রমুখ মুহাদ্দিস বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ২৭শে রজবের ফযীলত, এ তারিখের রাতের ইবাদাত, দিনে সিয়াম পালন বিষয়ে বর্ণিত সকল কথাই বানোয়াট জাল ও ভিত্তিহীন।[৫৫]

উপসংসার

মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই নাযিল হয় সূরা আল ইসরা বা সূরা বানী ইসরাঈল। এই সূরাতে মহানবীর (সা) বিস্ময়কর সফরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তদুপরি এই সূরায় এমন কতগুলো বিধান নাযিল করা হয়েছে যেগুলো বাস্তবায়িত হলে অনিবার্যভাবেই একটি সুন্দর সমাজ ও সভ্যতার আবির্ভাব ঘটবে। যেই সময় মহানবী (সা) ও তাঁর সাথীদের ওপর ইসলাম-বিদ্বেষীরা চরম অত্যাচার চালাচ্ছিলো তখন এই বিধানগুলো নাযিল করার অর্থ ছিলো, অচিরেই এই কঠিন পরিস্থিতির অবসান ঘটবে এবং মুসলিমদের নেতৃত্বে পৃথিবীতে এক অতুলনীয় সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ঘটবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পরবর্তী মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যেই মুশরিক, ইয়াহুদী ও খৃস্টান শক্তিকে পেছনে ফেলে মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়।

---

৫৪. আল আসার, আবদুল হাই লখনবী, পৃ. ৭৮।

৫৫. ইবনু হাজার আসকালানী, তাবয়ীনুল আজাব, পৃ. ৬৪, মোল্লা আলী কারী, আল আসরার, পৃ. ২৮৯, আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৫৫৪, আবদুল হাই লাখনবী, আল আসার, পৃ. ৭৭-৭৯।

www.amarboi.org

আল হিজাবের মর্মকথা

মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন

www.amarboi.org

মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন কর্তৃক রচিত "আল হিজাবের মর্মকথা" শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রথমে ২৭ জন ইসলামী চিন্তাবিদের নিকট পাঠানো হয়। অতপর এপ্রিল ১০, ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত "স্টাডি সেশনে" উপস্থাপিত হয়। গবেষণাপত্রটির মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে বক্তব্য রাখেন–

মাওলানা মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, অধ্যাপক এ.এন.এম. রাকিফুর রাহমান আলমাদানী, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম আলমাদানী, মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ খান, মাওলানা শফীকুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, ড. আ.জ.ম. কুতবুল ইসলাম নু'মানী, ড. নজরুল ইসলাম খান আলমা'রূফ, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক ও জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল হিজাব

হিজাব (পর্দা) ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান। প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য এ বিধান মেনে চলা ফরয। আল কুরআনের সূরা আন্ নূরের ৩০, ৩১ ও ৬০ নং আয়াতে এবং সূরা আল আহযাবের ৩২, ৩৩, ৫৩ ও ৫৯ নং আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে এবং সূরা আন্ নূরের ৫৮ ও ৫৯ নং আয়াতে পরোক্ষভাবে হিজাব বা পর্দার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে হিজাব সংক্রান্ত প্রায় ৭০টি হাদীস এসেছে।

এসব কিছুকে একত্রিত করে সামনে রাখলে আমাদের কাছে যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় তা হচ্ছে হিজাব এমন একটি ব্যবস্থা যা হাল্কাভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। একটি সুন্দর, পবিত্র ও আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য এই ব্যবস্থা অপরিহার্য। যেহেতু মানুষের সমষ্টি হচ্ছে সমাজ বা রাষ্ট্র তাই আল্লাহ্র হিদায়াত হচ্ছে– ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষ ভালো হয়ে গেলে, সৎ হয়ে গেলে গোটা সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্রও ভালো হয়ে যাবে। মোটকথা একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ ও সভ্যতার জন্য যেসব উপাদান একান্ত অপরিহার্য আল হিজাব তার অন্যতম উপাদান।

হিজাবের পরিচয়

হিজাব (حجاب) আরবী শব্দ। একবচন। বহুবচন হুজুব (حجب)। এই শব্দটি ক্রিয়ামূল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। শব্দমূল (ماده) ح - ج - ب। অর্থ– পর্দা, আড়াল, অন্তরাল, প্রতিবন্ধকতা।[১]

আল কুরআনে হিজাব শব্দের ব্যবহার ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন– وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ج

১. আল মাওরিদ, আরবী-ইংরেজী, পৃ-৪৫৩। এ্যারাবিক ইংলিশ ডিকশনারী। জর্জ মিল্টন কাওয়ান, পৃ-১৫৬-১৫৭। আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, পৃ-৩২৭। আল কুরআনের অভিধান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ-২৪১। ফার্সি-বাংলা-ইংরেজী অভিধান। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা থেকে প্রকাশিত, পৃ-২৭৭।

www.amarboi.org

'এবং উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝখানে একটি হিজাব বা পর্দা থাকবে।'[২]

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ـ

'কোনো মানুষের জন্য এমনটি হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। তিনি কথা বলেন, হয় ওহীর মাধ্যমে কিংবা পর্দার (হিজাব) অন্তরাল থেকে।'[৩]

وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا .

'আপনি যখন কুরআন পাঠ করেন তখন আমরা আপনার ও যারা পরকাল মানে না তাদের মাঝে অন্তরাল (হিজাব) সৃষ্টি করে দেই।'[৪]

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِىْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِىْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَّيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ .

'তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যে জিনিসের দিকে ডাক, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত, কর্ণ বধির এবং তোমার ও আমাদের মাঝখানে একটি পর্দা (হিজাব) আড়াল হয়ে আছে। কাজেই তুমি তোমার কাজ কর আর আমরা আমাদের কাজ করি।'[৫]

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِىِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ . فَقَالَ اِنِّىْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ ج حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .

'অপরাহ্নে যখন তার (অর্থাৎ সুলাইমানের) সামনে উৎকৃষ্ট ঘোড়া উপস্থিত করা হলো, তখন সে বললো, আমি তো আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে সম্পদের মোহে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি, এমনকি সূর্য আড়ালে চলে গেছে (অর্থাৎ ডুবে গেছে)।'[৬]

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ قف

২. সূরা আল আ'রাফ, আয়াত-৪৬।
৩. সূরা আশ শূরা, আয়াত-৫১।
৪. সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত-৪৫।
৫. সূরা হা মীম আস সাজদা, আয়াত-৫।
৬. সূরা ছোয়াদ, আয়াত : ৩১-৩২।

www.amarboi.org

'এই কিতাবে উল্লেখিত মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার আপনজনদের থেকে আলাদা হয়ে (জেরুসালেমের) পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল এবং তাদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য পর্দা টানিয়ে দিল।'[৭]

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط

'তোমরা তাদের কাছে কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এটিই উত্তম পন্থা।'[৮]

আল হাদীসে হিজাব শব্দের ব্যবহার

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ اَمَرْتَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحِجَابِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الْحِجَابِ .

'আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে তো ভালো মন্দ অনেক লোক আসে। আপনি যদি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দিতেন! তখন পর্দার আয়াত নাযিল হয়।'[৯]

عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَاَخَذَ كَاَنَّهُ يَتَهَيَّاُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا فَلَمَّا رَاٰى قَامَ . فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وَاِنَّ النَّبِيَّ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَاِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ثُمَّ اِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقُوْا فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ فَجَاءَ حَتّٰى دَخَلَ فَذَهَبْتُ اَدْخُلُ فَاَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ .

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যায়নাব (রা)-কে বিয়ে করলেন, তখন কিছু লোক দাওয়াত খেতে এসে খাওয়া দাওয়ার

৭. সূরা মারইয়াম, আয়াত : ১৬-১৭

৮. সূরা আল আহযাব, আয়াত : ৫৩।

৯. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস : ৪৪৩১ (ই.ফা)।

www.amarboi.org

পরও বসে আলাপ আলোচনা করতে থাকলেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন এমনভাব দেখালেন যেন তিনি উঠতে চাচ্ছেন (যাতে লোকগুলো চলে যায়), কিন্তু তারা উঠলেন না। এ অবস্থা দেখে তিনি উঠে গেলেন। তিনি উঠে যাওয়ার পর কিছু লোক ওঠে বেরিয়ে গেলেন। অবশিষ্ট লোক বসেই রইলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে প্রবেশের জন্য ফিরে এসে দেখলেন তারা তখনও বসে আছেন। কিছুক্ষণ পর তারা চলে গেলে আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাদের চলে যাওয়ার খবর দিলাম। তিনি এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমি ভেতরে যেতে চাইলে তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন।[১০] (তখন পর্দার আয়াত নাযিল হয়)

পারিভাষিক অর্থে হিজাব' হচ্ছে মহিলাদের রূপ সৌন্দর্য, অলংকার ও প্রসাধনী এবং শরীরের গঠন প্রকৃতি পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখা। অলংকারের শব্দ ও কণ্ঠস্বর যেন পরপুরুষের কানে না যায় সেজন্য নিয়ন্ত্রণে রাখা।

عورة ('আওরাহ-সতর) ও حجاب (হিজাব-পর্দা)-এর পার্থক্য

عَوْرَةٌ ('আওরাহ্) শব্দের আভিধানিক অর্থ– লজ্জা, লজ্জাস্থান, দোষ, ত্রুটি, উন্মুক্ত, অরক্ষিত ইত্যাদি। শরঈ পরিভাষায়– আওরাহ্ বা সতর বলা হয় শরীরের সেই অংশকে যা সারাক্ষণ ঢেকে রাখা জরুরী। যা অনাবৃত হয়ে পড়লে নামায নষ্ট হয়ে যায়। পুরুষের সতর বা 'আওরাহ্ হচ্ছে নাভি থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত অংশ। আর মহিলাদের আওরাহ্ বা সতর হচ্ছে মুখমণ্ডল, দু'হাতের পাঞ্জা এবং পায়ের গোড়ালীর নিচের অংশ ছাড়া অবশিষ্ট শরীর।[১১]

আওরাহ্ বা সতর বলতে যা বুঝায় তা সাধারণত মুসলিম মহিলারা ঢেকে রাখেন। যারা এর ব্যতিক্রম করেন তারা অপসংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত। প্রাপ্তবয়স্ক কোনো মেয়ে সতর কিংবা সতরের কোনো অংশ অনাবৃত রেখে চলাফেরা করবেন ইসলামী সংস্কৃতিতে এরূপ কথা কল্পনাও করা যায় না।

মালেকী ও হানাফী আলিমদের মতে মহিলাদের সতর : মালেকী ও হানাফী আলিমদের মতে মহিলাদের চেহারা ও হাতের পাঞ্জা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কারণ হিসেবে তারা নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহ দিয়ে থাকেন।

---

১০. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস : ৫৮০৫ (ই.ফা)।

১১. আল উম্ম-ইমাম শাফিঈ, ১ম খণ্ড, পৃ.-৮৯। আল মাজমু শরহে মুহাযযাব, ৩য় খণ্ড, পৃ.১৭৫।

www.amarboi.org

১. আল্লাহ্ বলেছেন–

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

'তারা সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না তবে স্বত:ই যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে (সেটি ভিন্ন কথা)।' 'স্বত:ই যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবা ও তাবিঈগণ মুখমণ্ডল ও হাতের কথা-ই বলেছেন। সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহ) বলেছেন– اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا বলতে চেহারা ও হাতের তালুর কথা বলা হয়েছে। দাহ্হাক (রহ) ও অনুরূপ ভাষ্য দিয়েছেন।[১২]

২. তাঁরা আয়িশা (রা) বর্ণিত আসমা (রা) সম্পর্কিত হাদীসটিও প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাত ও মুখের দিকে ইঙ্গিত করে খোলা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। বলা হয়েছে–

يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه

[একবার আবু বাকর (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) পাতলা কাপড় পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন]–

'হে আসমা! মেয়েরা যখন বালেগ হয় তখন এমন কাপড় পরা উচিত নয় যাতে তাদের শরীর দেখা যায়। তবে এইটুকু ছাড়া, একথা বলার সময় তিনি মুখমণ্ডল ও দু'হাতের তালুর দিকে ইঙ্গিত করলেন।[১৩]

৩. তাদের আরেকটি যুক্তি হচ্ছে– যেহেতু নামাযে এবং হজ্জের সময় চেহারা ও হাত খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে তাই এ দুটো অঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

শাফিঈ ও হাম্বলী আলিমদের মতে মহিলাদের সতর ঃ শাফিঈ ও হাম্বলীদের মতে কুরআন সুন্নাহ্ ও যুক্তির নিরিখে মহিলাদের চেহারা ও হাত সতরের অন্তর্ভুক্ত।

১. আল কুরআনে বলা হয়েছে– وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ (তারা যেন তাদের

১২. বিভিন্ন তাফসীরে সূরা আন নূরের ৩১ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩. সুনানু আবী দাউদ, হাদীস-৪০৫৯ (ই.ফা)।

www.amarboi.org

সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে) অর্থাৎ এ আয়াতে যীনাত বা সৌন্দর্য প্রদর্শন না করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সৌন্দর্য দুপ্রকার। একটি সৃষ্টিগত, অন্যটি অর্জিত। চেহারা সৃষ্টিগত সৌন্দর্য বরং সৌন্দর্যের মূল। আর এটিই বিপর্যয়ের উৎস। আর অর্জিত সৌন্দর্য হচ্ছে অলংকার, পোশাক, সুরমা, হেয়ার কালার তথা প্রসাধনী। আয়াতে কারীমায় নিষেধ করা হয়েছে সৌন্দর্য প্রকাশ বা প্রদর্শন করতে। তারপর إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا বলে যা ব্যতিক্রম করা হয়েছে তা হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত যা কিছু প্রকাশিত হয়ে যায়। যেমন গলা, পায়ের গোছা কিংবা পোশাকের বাইরের অংশ।

২. অনেকগুলো সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, মহিলাদের চেহারার দিকে দৃষ্টি দেয়া নিষেধ। যেমন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলীকে (রা) লক্ষ্য করে বলেছেন–

يا على لا تتبع النظرة النظرة فانما لك الا ولى وليست لك الاخرة ـ

'হে আলী! (কোনো মহিলার ওপর) একবার দৃষ্টি পড়ে গেলে পুনরায় দৃষ্টি দেবে না। প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য ক্ষমাযোগ্য, পরেরটি নয়।'[১৪]

হজ্জের সময় ফদল ইবনুল আব্বাস এক মহিলার দিকে বারবার তাকাতে থাকলে বারবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন।[১৫]

এ সমস্ত নস্ (অকাট্য দলিল) প্রমাণ করে অপরিচিত মহিলার দিকে তাকানোর নিষিদ্ধতা। আর এই নিষিদ্ধতাই প্রমাণ করে তাদের চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত।

৩. তারা নিম্নোক্ত এ আয়াতটিও দলিল হিসেবে পেশ করেন। যেখানে বলা হয়েছে–

وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءَ حِجَابٍ ـ

'এবং যখন তাদের কাছে কিছু চাইতে হয় তা পর্দার আড়াল থেকে চাও।'[১৬]

এ আয়াতটিও প্রমাণ করে চেহারার দিকে তাকানো বৈধ নয়। এ আয়াতটি নবীপত্নীদের সম্বোধন করে নাযিল করা হলেও সকল মহিলাই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত।[১৭]

---

১৪. মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ।

১৫. সহীহ্ মুসলিম, হাদীস ৩১১৭ (ই. ফা)।

১৬. সূরা আল আহযাব। আয়াত- ৫৩।

১৭. ফকীহদের এ আলোচনা বিস্তারিত দেখুন, তাফসীর আয়াতুল আহকাম, মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৪-১৫৬।

www.amarboi.org

ইসলাম 'আওরাহ্ বা সতর ঢেকে রাখার সাথে সাথে মহিলাদের অতিরিক্ত আরেকটি নির্দেশ দিয়েছে, যাকে 'হিজাব' বা পর্দা বলা হয়েছে। 'হিজাব' আওরাহ্ বা সতরের মতই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। কিন্তু তা আওরাহ্ বা সতর নয়। আওরাহ্ বা সতরের চেয়ে অতিরিক্ত জিনিস। সেই অতিরিক্ত জিনিসটি কী? উত্তরে বলা যায় সেই অতিরিক্ত জিনিসটি হচ্ছে শরীরের সেই অংশের পর্দা যা আওরাহ্ বা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা হতে পারে মুখমণ্ডল, হাত, পা কিংবা শরীরের অন্য কোন অংশ, যা সতর আবৃত হওয়ার পরও পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ) তাঁর তাফসীর মা'আরিফুল কুরআনে লিখেছেন–

مرد وعورت کا وہ حصّہ بدن جسکو عربی میں عورت اور اردو فارسی میں ستر کہتے ہیں جس کا سب سے چھپانا شرعی طبعی اور عقلی طور پر فرض ہے، اور ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض جس پر عمل ضروری ہے، وہ ستر عورت یعنی اعضا ئے مستورہ کا چھپانا ہے ..... اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ستر عورت، اور حجاب نساء یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں ستر عورت ہمیشہ سے فرض ہے، حجاب نساء سنہ پانچ ہجری میں فرض ہوا، ستر عورت مرد و عورت دونوں پر فرض ہے اور حجاب صرف عورتوں پر، ستر عورت لوگوں کے سامنے اور خلوت دونوں میں فرض ہے حجاب صرف اجنبی کی موجود گی میں،

'পুরুষ ও মহিলার শরীরের সেই অংশকে আরবীতে 'আওরাত' এবং উর্দু ও ফার্সীতে 'সতর' বলে যা সর্বদা ঢেকে রাখা শরঈ, স্বভাবগত এবং যৌক্তিক দিক থেকে ফরয। এমনকি ঈমানের পর সবচেয়ে প্রথম ফরয যার ওপর আমল করা অপরিহার্য তা হচ্ছে 'সতরে আওরাত' অর্থাৎ শরীরের গোপন অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখা। .....উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল 'সতরে আওরাত' এবং 'মহিলাদের হিজাব' দুটো পৃথক জিনিস। 'সতরে আওরাত' আদিকাল থেকে ফরয, আর হিজাব ফরয হয়েছে হিজরী ৫ম সনে। 'সতরে আওরাত' (সতর ঢেকে রাখা) পুরুষ মহিলা উভয়ের ওপর ফরয আর 'হিজাব' শুধু মহিলাদের জন্য ফরয। আওরাত বা সতর লোকদের সামনে এবং নিরিবিলিতে উভয় অবস্থায় ঢেকে রাখা

www.amarboi.org

আবশ্যক।[১৮] আর হিজাব মেনে চলা হয় শুধু গাইরি মুহাররাম বা পর পুরুষের উপস্থিতিতে।'[১৯]

তাফসীরে বাইযাভীতে বলা হয়েছে–

الا ظهران لهذا فى الصلاة لا فى النظرفان كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر الى شئ منها الا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ـ

'স্পষ্টত এখানে চেহারা ও হাতের তালুকে (সতরের অন্তর্ভুক্ত করা থেকে) বাদ রাখা হয়েছে নামাযের ক্ষেত্রে, দেখার ক্ষেত্রে নয়। কেননা স্বাধীন মহিলাদের সমস্ত দেহ-ই সতর। স্বামী ও মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া তাদের শরীরের কোনো অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হালাল (বৈধ) নয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জায়েয। যেমন চিকিৎসা ও সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে।'[২০]

এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দীন হাফিয মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্দালভী (রহ) লিখেছেন–

ایمان والی عورتیں اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر زیب وزینت کی وہ چیز جو عادتا اور غالبًا کھلی رہتی ہے یعنی جس کا چھپانا اور پوشیدہ رکھنا عادةً ممکن نہیں جیسے چہرہ اور دونوں ہاتھ کہ ہر وقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے بغیر منہ کھولے عورت گھر میں چل پھر نہیں سکتی اور بغیرہاتھوں کے گھرکا کام کاج نہیں کر سکتی - توجس زینت کا چھپانا اور اس کو مستور رکھنا ممکن نہیں تو ایسی زینت کے کھلا رکھنے میں مضائقہ نہیں اور جب ابداء زینت یعنی اظہار زینت حرام ہوا تو اس کی نقیض اور ضد یعنی اخفاء زینت فرض

১৮. তবে কখনও কখনও নিরিবিলিতে সতর খোলা মুবাহ্। যেমন গোসলের সময় যদি অন্য কেউ দেখার আশংকা না থাকে। কিংবা অত্যধিক গরমের সময় যদি পুরুষদের দেখার সুযোগ না থাকে তাহলে সতরের পুরো অংশ ঢেকে না রাখারও সুযোগ রয়েছে। – লেখক

১৯. মা'আরিফুল কুরআন– মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ), সূরা আহযাব, পৃ. ৮৯, ৯০ ও ৯১।

২০. তাফসীর বাইযাভী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৬-১১৭।

www.amarboi.org

اور واجب ہوگی مطلب یہ ہے کہ عورت کا تمام بدن ستر ہے اپنے گھر میں بھی اس کو مستور اور پو شیدہ رکھنا فرض اور لازم ہے مگر چہرہ اور دونوں ہاتھ کہ ہر وقت ان کو چھپا ئے رکھنا بہت دشوار ہے اس لئے یہ اعضاء ستر سے خارج ہیں اپنے گھر میں ان اعضاء کو کھلا رکھنا جائز ہے ۔ضروریات زندگی ان اعضاء کے کھلے رکھنے پر مجبور کرتی ہیں اگر مطلقًا ان اعضاء کے چھپانے کا بھی حکم دیا جاتا تو عورتوں کےلئے اپنے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش ائی اس لئے شریعت نے ان اعضاء کو ستر سے خارج کردیا – ان اعضاء کے علاوہ عورت کا تمام بدن ستر ہے جس کا ہر وقت پوشیدہ رکھنا واجب ہے اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت کو اپنے چہرہ کے حسن وجمال کو نامحرم مردوں کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے اور نہ اجنبی مردوں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ عورتوں کے حسن وجمال کا نظارہ کیا کریں اور ان سے انکھیں لڑایا کریں – شریعت کی طرف سے کسی عورت کو کسی عضو کے کھو لنے کی اجازت دینا اس کو مستلزم نہیں کہ مرد کو اس کی طرف دیکھنا بھی جائزہو ، شریعت مطہرہ اس بات سے پاك اور منزہ ہے کہ مرد اور عورت کو اس قسم کی بے حیائی کی اجازت دے اور مرد عورت کو زنا کی دہلیز پر قدم رکھنے کی اجازت دے – حاشا وکلاّ عورت کےلئے اپنی زیبائش یعنی مواضع زینت کا اظہار سوائے محارم کے جن کا ذکر آیندہ آیت میں آریاہے اور کسی کے سامنے ہر گز ہر گز جائز نہیں اور محارم کے سامنے آنے کی بھی یہی شرط ہے کہ کسے فتنہ کا اندیشہ نہ ہو – اور یہ سامنے آنا ازراہ شفقت قرابت ہونہ کہ بطریق شہوت ہو – بطریق شہوت تو محارم کے سامنے آنا بھی ناجائز ہے اور حرام ہے – غرض یہ کہ ان آیات میں

www.amarboi.org

محض ستر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے یعنی فی حد ذاتہ عورت کو خواہ اپنے گھر کے اندر ہو یا باہر ہو کس حصہ بدن کا مستور رکھنا واجب ہے اور کس حصہ بدن کا کھلا رکھنا جائز ہے ، اس جملہ میں اس سے بحث نہیں کہ کس سے اپنا چہرہ چھپا ئیں اور کس کے سامنے ظاہر کریں، اس کی تفصیل آئندہ آیت میں آنے والی ہے - غرض یہ کہ اس آیت میں فقط یہ بتلانا ہے کہ بدن کا کتنا حصّہ فی ذاتہ اور فی نفسہ قابل ستر ہے اور کتنا حصّہ قابل کشف اور اظہار ہے، اس آیت میں فقط عورتوں کا مسئلہ بیان کیا گیا - معاذ اللّٰہ معاذ اللّٰہ نا محرم مردوں کو عورتوں کے دیکھنے کی اجازت نہیں دی گی، کسی مسئلہ میں عورتوں کی کسی اجازت سے مردوں کی اجازت کا مسئلہ نکالنا حماقت ہے -

'ঈমানদার মহিলারা যেন তাদের রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে না বেড়ায়। প্রকৃতিগতভাবে এবং আপনা আপনি যা প্রকাশ পায় সেটি ভিন্ন কথা। অর্থাৎ যা গোপন করা বা ঢেকে রাখা প্রকৃতিগতভাবেই সম্ভব নয়। যেমন– চেহারা, হাত ইত্যাদি। কাজকর্মে লিপ্ত থাকাবস্থায় এগুলো ঢেকে রাখা খুবই কষ্টকর। মুখমণ্ডল খোলা না রেখে মহিলাদের বাড়িতে চলাফেরা করা অসম্ভব। হাত খোলা ছাড়া তো ঘর-গৃহস্থালীর কাজই করা সম্ভব নয়। কাজেই যে সৌন্দর্য গোপন রাখা সম্ভবই নয় তা প্রকাশ করাতে কোনো দোষ নেই। তাছাড়া সৌন্দর্য প্রকাশ করা যদি হারাম হয় তাহলে তার বিপরীতার্থে সৌন্দর্য গোপন রাখা ফরয। মোটকথা মহিলাদের সারা শরীরই সতর। সারাক্ষণ তা ঢেকে রাখা ফরয।[২১] নিজের বাড়িতে হলেও। কিন্তু চেহারা ও দু'হাত সারাক্ষণ ঢেকে রাখা কষ্টকর। তাই এ দু'টো অঙ্গকে সতরের বাইরে রাখা হয়েছে। বাড়িতে এ দু'টো অঙ্গ খোলা রাখা জায়েয। জীবনের প্রয়োজনেই এটি করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মহিলারা তাদের রূপ সৌন্দর্য পরপুরুষকে দেখিয়ে বেড়াবে। আর পুরুষদেরকেও এ অনুমতি দেয়া হয়নি, তাদের রূপ সৌন্দর্য দেখে চোখ জুড়াবে। শরী'আহ্ কোনো মহিলাকে তার কোনো অঙ্গ খোলার অনুমতি দেয়া মানে পুরুষ তা দেখতে পারবে ব্যাপারটি এমন নয়। মহিলারা বেহায়াপনায় লিপ্ত হবে আর পুরুষরা তা দেখে দেখে কামনার আগুনে জ্বলবে, এমন নির্লজ্জ ও বেহায়াপনার পঙ্কিলতা থেকে শরী'আহ্ পবিত্র। মোটকথা মহিলারা তাদের রূপ সৌন্দর্য ও সাজগোজ মুহাররাম পুরুষ

২১. ১৮ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

(যাদের বর্ণনা সামনে আসবে) ছাড়া আর কাউকে দেখাতে পারবে না। হারাম। মুহাররাম পুরুষকে দেখাতে পারবে তাও শর্ত সাপেক্ষে। সেই শর্তটি হচ্ছে যদি ফিতনা (বিপর্যয়) এর আশঙ্কা না থাকে। যদি থাকে তাহলে মুহাররাম আত্মীয়ের সাথেও দেখা দেয়া জায়েয নয়। হারাম। এ আয়াতে মূলত সতরের সীমা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। যাতে মহিলারা বাড়িতে সতর ঢেকে রেখে চলাফেরা ও কাজকর্ম করতে পারে। তাই বলে দেয়া হচ্ছে কতটুকু ঢেকে রাখা ওয়াজিব আর কতটুকু খোলা রাখা জায়েয। এ আয়াতে অবশ্যই একথা বলা হয়নি কার সামনে মুখ খোলা রাখা যাবে এবং কার সামনে মুখ ঢেকে রাখতে হবে। এ সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। তাই এ আয়াত দিয়ে যদি পুরুষ মহিলাদের দেখা সাক্ষাতের দলিল পেশ করা হয় তা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।'[২২]

অতঃপর তিনি সূরা আল আহযাব এর তাফসীরে লিখেছেন–

بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا اور وہ بھی بلا پردہ اور بلا نقاب کے شریعت میں وہ قطعًا ممنوع ہے بلا پردہ اور بلا نقاب عورت کا گھر سے باہر قدم نکالنا شہوانی اور نفسانی لوگوں کی سوئی ہوئی طمع کو جگاتا ہے – شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ بدمعاشوں کی ناپاک نظروں سے عورت کے چہرہ کی حفاظت کی جائے اس لئے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نہ نکلیں ..... قانون شریعت میں زنا کے ذرائع اور وسائل بھی ممنوع اور حرام ہیں مثلاً نا محرم کو دیکھنا اور اس سے باتیں کرنا یا اس کی باتیں سننا – کما قال تعالی "ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئك کان عنه مسئولا" غرض یہ کہ عورتوں کا اپنے گھروں میں قرار پکڑنا بد باطنوں کی طمع سے حفاظت کا پورا سامان ہے اسے لئے اب اسی حکم کی تاکید کے لئے ارشاد فرماتے ہیں اور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق تم اپنی زیب وزینت دکھاتی نہ پھرو – زمانہ جاہلیت کی عورتیں بے پردہ پھرتی تھیں اور اپنے حسن وجمال اور زیب وزینت اور آرائش وزیبائش کا علانیہ مظاہرہ کرتی تھیں شریعت مقدسہ نے اس

২২. তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, আল্লামা ইদরীস কান্ধালভী। খণ্ড-৫, পৃ. ৪৮৫-৪৮৬।

www.amarboi.org

بیحیائی کو تمام عورتوں کے لئے عموماً ازواج مطہرات کے لئے خصوصاً خاص طور پر حرام اور ممنوع قرار دیا ..... ہر ادنی عقل والا جانتا ہے کہ ایسا خروج جس میں زینت کا اظہار ہو اور غیر مردوں سے فقط کلام ہی نہ ہو بلکہ ہنسی اور دل لگی بھی ہو بلاشبہ موجب فتنہ ہے اور زنا کا مقدمہ ہے جس کسی عقل کے اندھے کو بھی شبہ نہیں اس فتنہ کا انسداد بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ عورتیں اپنے گھروں ہی میں رہیں اور بلا ضرورت گھرسے باہر نہ نکلیں اور اگر شدید ضرورت کی بناپر باہر نکلیں تو بغیر زینت کے اپنے تمام بدن کو ڈھک کر اور میلے کچیلے کپڑوں میں نکلیں اور سڑک کے کنارے کنارے مردوں سے الگ تھلگ ہوکر چلیں عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی یہ تمام قیود احادیث سے ثابت ہیں –

'অপ্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হওয়া, বিশেষ করে পর্দা ও নিকাব ছাড়া, শরী'আহ্ কোনো মতেই অনুমোদন করে না। তা নিষিদ্ধ বা হারাম। পর্দা ও নিকাব ছাড়া মহিলারা বাইরে বেরুলে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের অন্তরে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে। পবিত্র শরী'আহ্ চায় দুষ্ট লোকদের নোংরা দৃষ্টি থেকে মহিলাদের চেহারাকে আড়াল করতে। এজন্য প্রথমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে না যেতে।.....

শরঈ আইনে ব্যভিচার যেমন নিষিদ্ধ-হারাম, ব্যভিচার সংঘটনের যাবতীয় উপায় উপকরণও নিষিদ্ধ-হারাম। যেমন– বেগানা পুরুষের সাথে দেখা দেয়া, তার সাথে মিষ্টি সুরে কথা বলা, যিনার মতই নিষিদ্ধ। কেননা এগুলো যিনা সংঘটিত হবার প্রাথমিক উপায় উপকরণ। তাছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন–

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً .

'অবশ্যই চোখ, কান ও মন এদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞেস করা হবে।'

মোটকথা মহিলাদের বাড়িতে অবস্থান করা কামুক ও লম্পটদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার সর্বোত্তম উপায়। সেজন্যই আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে– 'আগের জাহিলিয়াতের মত সাজগোজ করে রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না।' জাহিলী যুগে মহিলারা সেজেগুজে রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াতো। পর্দার ধার ধারতো

www.amarboi.org

না। তাই পবিত্র শরী'আতে এই ধরনের নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুসলিম মহিলাদেরকে সাধারণভাবে এবং নবী পত্নীদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আইনগতভাবে বেপর্দাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।..... স্বল্প বুদ্ধির কোনো লোকেরও এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ানো, পরপুরুষের সাথে হাসি-ঠাট্টা করা– এগুলো ফিতনা (বিপর্যয়)-এর প্রাথমিক পদক্ষেপ। তাই মহিলাদের বাড়িতেই অবস্থান করা উচিত। একান্ত প্রয়োজনে যদি বাইরে যেতেই হয় তাহলে রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে সারা শরীর ঢেকে পুরনো কাপড় পরে বাইরে বের হতে হবে। আর রাস্তার পাশ দিয়ে পুরুষের ভিড় এড়িয়ে চলতে হবে। এই সবগুলো নির্দেশের কথা-ই হাদীসে এসেছে।'[২৩]

আল কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীরকার, আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল আলা মওদূদী (রহ) তাঁর বিশ্বখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে লিখেছেন–

پھراس سے بھی زیادہ قابل تعجب بات یہ ہے کہ اس رخصت کے حق میں دلیل گے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ منہ اور ہاتھ عورت کے ستر میں داخل نہیں ھیں – حالانکہ ستر اور حجاب میں زمین وآسمان کا فرق ہے ستر تو وہ چیز ہے جسے محرم مردوں کے سامنے کھولنا بھی ناجائز ہے – رہا حجاب، تو وہ سترسے زائد ایك چیز ہے جسے عورتوں اور غیر محرم مردوں کے درمیان حائل کیا گیاہے اور یہاں بحث سترکی نہیں بلکہ احکام حجاب کی ہے –

'এর চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ অবকাশের (অর্থাৎ স্বত:ই যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে) পক্ষে যুক্তি হিসেবে একথা পেশ করা হয় যে, মুখ ও হাত মহিলাদের সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ সতর ও হিজাবের মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য। সতর মাহরাম পুরুষদের সামনে খোলাও জায়েয নয়। আর হিজাব তো সতরের অতিরিক্ত একটি জিনিস, যাকে নারীদের ও গাইরি মাহরাম পুরুষদের মাঝখানে আঁটকে দেয়া হয়েছে এবং এখানে সতরের নয় বরং হিজাবের বিধান আলোচ্য বিষয়।'[২৪]

---

২৩. তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, আল্লামা ইদরীস কান্দালভী। খণ্ড-৫, পৃ. ৪৮৫-৪৮৬।

২৪. তাফহীমুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, সূরা আন নূর, টীকা-৩৫।

www.amarboi.org

হিজাব বা পর্দা নবীপত্নীদের জন্য নির্দিষ্ট কিনা

এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমরা দৃষ্টি দেবো। হিজাবের আয়াতের মর্মার্থ নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা যায়। অনেক তাফসীরকার মনে করেছেন হিজাব বা পর্দার নির্দেশ শুধুমাত্র নবীপত্নীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। সাধারণ মুসলিম মহিলারা এ নির্দেশের আওতায় পড়েন না। সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় তাঁরা সতর ও পর্দার মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য করতে পারেননি। তাঁরা মনে করেছেন সাধারণ মুসলিম মহিলারা সতর মেনে চললেই দায়মুক্ত হয়ে যাবেন, হিজাব মেনে চলার প্রয়োজন নেই। এমনকি তা তাদের জন্য বাধ্যতামূলকও নয়, ঐচ্ছিক। তা বড়জোর মুস্তাহাব বা মুস্তাহসানা (উত্তম)-এর পর্যায়ের। কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী [আওরাহ (সতর) ও হিজাব (পর্দা) এর পার্থক্য] শিরোনামের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পর্দা ও সতর ভিন্ন জিনিস, এক জিনিস নয়। আর তা প্রতিটি মুসলিম মহিলার জন্য মেনে চলা আবশ্যক। যেসব তাফসীরকার এ নির্দেশকে নবীপত্নীদের জন্য 'খাস' (নির্দিষ্ট) মনে না করে 'আম' (সর্বজনীন) মনে করেন তাঁদের কয়েকজনের বক্তব্য তুলে ধরছি।

আল্লামা ইদরীস কান্দালভী তাঁর রচিত তাফসীর মা'আরিফুল কুরআনে সূরা আল আহযাব-এর তাফসীরে লিখেছেন–

یہ کہ ان آیات مین جس قدر بھی احکام مذکور ہیں وہ ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام عورتوں کے لئے عام ہیں – البتہ ازواج مطہرات کے حق میں ان کی خصوصیت کی وجہ سے سب سے زیادہ موکد اور مہتم بالشان ہیں جیسے عالم دین پر بہ نسبت جاہل کے احکام شریعت کی پابندی زیادہ لازم ہے – اسی طرح ان احکام کی پابندی ازواج مطہرات کی لئے تمام عورتوں سے زیادہ لازم اور موکد ہے اس لئے کہ وہ اھل بیت نبی ہیں اور امہات المؤمنین ہین – اس لئے ان کا فریضہ اورزمہ داری تمام عورتوں سے بڑھکر ہے – اور یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں کہ یہ احکام ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہیں – جب علت عام ہے تو لا محالہ حکم بھی عام ہو گا – کیا کوئی ادنی عقل والا اس کے

www.amarboi.org

کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ آیت مذکورۃ میں تبرج جاہلیت تک بے حیائی کی روک تھام کے لئے جوتین حکم دئے گئے ہیں وہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان دلدار گاں مغربیت کے لئے اور ان کی بیگمات کے لئے ہر بیحیائی جائز ہے اور نماز اور زکوۃ اور اطاعت خدا ورسول اور تقوی اور اعمال صالح میں سے کوئے چیز ان پر فرض نہیں اس لئے کہ ان آیات میں تمام خطابات صرف ازواج مطہرات کو ہیں -

غرض یہ کہ جو احکامات ان آیات میں مذکور ہیں وہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں سب مسلمان عورتوں کےلئے ہیں - البتہ ازواج مطہرات کےلئے ان کے تقدس اور طہارت اور علوّمرتبت کی وجہ سے ان احکام کے پابندی سب سے زیادہ ان پر ضروری اور لازم ہے - پس ثابت ہوگیا کہ قرار فی البیوت تمام مسلمان عورتوں پر فرض اور لازم ہے اور بلا ضرورت منہ کھو لے گھر سے باہر نکلنا بلا شبہ موجب معصیت اور محل فتنہ وفساد ہے -

آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے - "المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفھا الشیطا" یعنی عورت سراپا سترہے جس کا مستور رکھنا واجب ہے جب وہ گھرسے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے سر اٹھا کر دیکھتا ہے اور اس کی تاک لگ جاتا ہے پھر کراتا جو کراتا ہے -

অর্থ : 'উপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহে যেসব নির্দেশ বা নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে তা নবীপত্নীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং তা সকল মহিলার জন্যই সাধারণ নীতিমালা। তবে দীনি আহকাম সম্পর্কে অশিক্ষিত লোকদের বাধ্যবাধকতা যতটুকু, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি বাধ্যবাধকতা একজন শিক্ষিত লোকের (আলিমের) জন্য। তেমনিভাবে এসব আয়াতের বাধ্যবাধকতাও একজন সাধারণ মহিলার চেয়ে একজন নবী-পত্নীর অনেক বেশি। নবী-পত্নীদের উল্লেখ করে মূলত সেই কথাই বুঝানো হয়েছে। কারণ তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.amarboi.org

ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারের সদস্য সেই সাথে মুমিনগণের মা, তাই তাঁদের মর্যাদা যেমন বেশি তেমনি দায়দায়িত্বও অনেক বড়ো, যা সাধারণ মহিলাদের সাথে তুলনা হতে পারে না। এ নির্দেশ কেবলমাত্র নবীপত্নীদের জন্য নির্দিষ্ট একথা কিভাবে ঠিক হবে? যখন এসব ত্রুটি বিচ্যুতি সাধারণত সকলের বেলায়ই ঘটতে পারে। যেহেতু সকলের বেলায় ঘটতে পারে, তাই নির্দেশও সকলের জন্যই প্রযোজ্য। একজন স্বল্পবুদ্ধির লোকও একথা মনে করবে না, জাহিলী যুগের মত ঠাট-ঠমক প্রদর্শন করে বেড়ানো শুধু নবী-পত্নীদের জন্য নিষিদ্ধ, নিজেদের স্ত্রী, মা-বোন নির্লজ্জের মত রূপ, যৌবন, সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াবে, এতে কোনো দোষ নেই। নামায, যাকাত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য, তাকওয়া, আমলে সালিহ্ এসব নির্দেশও কেবল নবীপত্নীদের জন্য। এসব ব্যাপারে সাধারণ মুসলিম মহিলাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। (অবশ্যই এরূপ যুক্তি মেনে নেয়া যায় না)।

মোটকথা এসব আয়াতে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা নবী-পত্নীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। সকল মহিলার জন্যই প্রযোজ্য। কেবল মান মর্যাদা ও অবস্থানের কারণে নবী-পত্নীদের বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, বাড়িতে অবস্থান করা প্রত্যেক মুসলিম মহিলার জন্যই আবশ্যক। বিনা প্রয়োজনে মুখমণ্ডল খোলা রেখে বাড়ি থেকে বের হওয়া নিঃসন্দেহে অপরাধ এবং ফিতনা (বিপর্যয়) সৃষ্টির কারণ।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসে (যা সকল মহিলার জন্যই প্রযোজ্য) বলা হয়েছে–

المرأة عورة فاذا خرجت استشر فها الشيطان

'নারী গোপন থাকার জিনিস। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয় তখন শয়তান মাথা উঁচু করে তাকে দেখতে থাকে, তারপর তার পিছু নেয় এবং যা কিছু করানোর করায়।'[২৫]

আল্লামা আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু আহ্মাদ আল কুরতুবী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন–

هذه الاية الآمر بلزوم البيت، وان كان الخطاب لنساء النبى صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو

২৫. তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, আল্লামা ইদরীস কান্দালভী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৭।

www.amarboi.org

لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها الا لضرورة، على ما تقدم فى غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بملازمة بيوتهن، وخاطبهنّ بذلك تشريفًا لهنّ، ونهاهنّ عن التبرج، وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى.

'আয়াতে আদেশ সূচক শব্দ প্রয়োগের অর্থই হচ্ছে বাড়িতে অবস্থান করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। যদিও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু অর্থের দৃষ্টিতে অন্য মহিলাগণও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। যদিও এখানে সব মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রকাশ্য দলিল নেই। তবু সকল মহিলা-ই এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেনই বা হবে না, বিনা প্রয়োজনে তাদের বাড়ির বাইরে যেতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে তেমনিভাবে স্থির হয়ে বাড়িতে অবস্থান করা তাদের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে। সুতরাং সৌন্দর্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা, জাহিলী যুগের মত সাজসজ্জা না করা এবং বাড়িতে অবস্থানের ব্যাপারে নবী-পত্নীদের সম্বোধন করার অর্থই হচ্ছে, তাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা। (অন্যদেরকে এ নির্দেশের আওতামুক্ত রাখা নয়।) তাদেরকে তাবাররুজ (রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন) করতে নিষেধ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে সেটি পূর্ববর্তী যুগের জাহেলিয়াত (মূর্খতা)।'[২৬]

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ)– তাঁর তাফসীর বায়ানুল কুরআন– বাংলা তাফসীরে আশরাফীতে লিখেছেন–

'কোনো কোনো আলিম বলেছেন, 'পর্দার নির্দেশটি নবী-পত্নীদের জন্য 'খাস' (নির্দিষ্ট),' যদি এ কথা দ্বারা সন্দেহ হয় যে, قرن নির্দেশটি সাধারণ মহিলাদের জন্য নয়, তার উত্তরে বলা যায়– এ আদেশের ফলে নবীপত্নীদের জন্য পর্দা করা প্রত্যক্ষরূপে ফরয হয়েছে। এ নির্দেশের লক্ষ্য হচ্ছে অনর্থের পথ রোধ করা। তাই বলা যায় অনর্থের পথ রোধ করা-ই যদি এ আয়াতের উদ্দেশ্য হয় তাহলে সাধারণ মহিলাদের জন্য পরোক্ষভাবে পর্দা ফরয হয়েছে। একই কারণে لا تخضعن এবং

২৬. আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী) ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৮।

www.amarboi.org

لا تبرجن নির্দেশগুলোকে কেউ-ই নবীপত্নীগণের জন্য নির্দিষ্ট বলেননি। কারণ অনর্থের পথ বন্ধ করার জন্য এটি সকল মহিলারই প্রয়োজন। সুতরাং এই দু'টো নির্দেশের মধ্যস্থলে وقرن নির্দেশটি নবীপত্নীদের জন্য কেন 'খাস' (নির্দিষ্ট) হবে?[২৭]

আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) লিখেছেন–

بعض لوگ صرف اس بنیاد پر که ان آیات کا خطاب نبی صلی اللّه علیه وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے، یه دعوی کربیٹھتے ہیں که یه احکام انہی کے لے خاص ہیں لیکن آگے ان آیات میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اسے پڑه کر دیکھ لیجیے - کونسی بات ایسی ہے جو حضور (ص) کی ازواج کے یے خاص ہو اور باقی مسلمان عورتوں کے لئے مطلوب نه ہو؟ کیا اللّه تعالی کا منشایہی ہو سکتا تها که صرف ازواج مطہرات ہی گندگی سے پاك ہوں، اور وہی اللّه ورسول کی اطاعت کریں اور وہی نمازیں پڑهیں اور زکوة دیں ؟ اگر یه منشا نہیں ہو سکتا تو پھر گھروں میں چین سے بیٹھنے اور تبرج جاہلیت سے پر ہیزکرنے اور غیر مرودں کے ساته دبی زبان سے بات نه کرنے کا حکم ان کے لیے کیسے خاص ہو سکتا ہے ؟ اور باقی مسلمان عورتیں اس سے مستثنی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی معقول دلیل ایسی ہے جس کی بناپر ایك ہی سلسلئ کلام کے مجموعی احکام میں سے بعض کو عام اور بعض کو خاص قرار دیاجائے ؟

رہایه فقرہ که "تم عام عورتوں کی طرح نیہں ہو" تو اس سے بهی یه مطلب نہیں نکلتا که عام عورتوں کو تو بن ٹهن کر نکلنا چاہے اور غیر مردوں سے خوب لگاوٹ کی باتیں کرنی چاهیے، البته تم ایسا طرزعمل اختیار نه کر - بلکه اس کے بر عکس یطرز کلام

২৭. তাফসীরে আশরাফী, সূরা আহযাব, পৃ. ৮।

www.amarboi.org

کچھ اس طرح کا ہے جیسے ایک شریف آدمی اپنے بچے سے کہتا ہے کہ "تم بازاری بچون کی طرح نہیں ہو تمہیں گالی نہ بکنی چا ہیے" اس سے کوئی عقلمند آدمی بھی کہنے والے کا یہ مدعا اخذ نہ کرے گا کہ وہ صرف اپنے بچے کے ہے گالیاں بکنے کو برا سمجھتا ہے دوسرے بچوں میں یہ عیب موجود رہے تو اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے -

অর্থ : 'এ আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল এরই ভিত্তিতে কেউ কেউ দাবী করে বসেছেন যে, এ বিধানগুলো কেবল তাঁদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সামনের দিকে এ আয়াতগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে তা পাঠ করে দেখুন। এর মধ্যে কোনটি এমন যা শুধু নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র স্ত্রীদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাকী মুসলিম নারীদের জন্য কাঙ্খিত নয়? কেবল নবীর স্ত্রীগণই আবর্জনামুক্ত নিষ্কলুষ জীবন যাপন করবেন, তাঁরা-ই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবেন, নামায তাঁরা-ই পড়বেন এবং যাকাত তাঁরা-ই দেবেন, আল্লাহর উদ্দেশ্য কি এমনটি হতে পারে? যদি এমনটি হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে গৃহকোণে নিশ্চিন্তে বসে থাকা, জাহিলী সাজসজ্জা থেকে দূরে থাকা এবং পরপুরুষের সাথে মৃদু স্বরে কথা বলার হুকুম একমাত্র তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য সকল মুসলিম নারীরা তা থেকে আলাদা হতে পারে কেমন করে? একই কথার ধারাবাহিকতায় বিধৃত সামগ্রিক বিধানের মধ্য থেকে কিছু বিধিকে বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ও কিছু বিধিকে সর্বসাধারণের পালনীয় গণ্য করার পেছনে কোনো ন্যায়-সঙ্গত যুক্তি আছে কি? আর "তোমরা সাধারণ নারীদের মত নও" -এ বাক্যটি থেকেও এ অর্থ বুঝায় না যে, সাধারণ নারীদের সাজসজ্জা করে বাইরে বের হওয়া এবং পরপুরুষের সাথে ঢলাঢলি করে কথাবার্তা বলা উচিত। বরং এ কথাটা কিছুটা এমনি ধরনের যেমন এক ভদ্রলোক নিজের সন্তানদেরকে বলে 'তোমরা বাজারের ছেলেমেয়েদের মত নও। গালাগালি করা তোমাদের উচিত নয়।' এ থেকে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করবে না যে, সে কেবল নিজের ছেলে মেয়েদের জন্য গালি দেয়াকে খারাপ মনে করে। অন্য ছেলে মেয়েদের মধ্যে এ দোষ থাকলে তাতে তার কোনো আপত্তি নেই।"[২৮]

---

২৮. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা-৪৬।

www.amarboi.org

বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআনুল কারীম প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, সৌদি আরব কর্তৃক উর্দূ ভাষায় সংকলিত ও মুদ্রিত কুরআনুল কারীম-এ সূরা আল আহযাবের টীকায় বলা হয়েছে–

یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کاسا نہیں ہے - بلکہ اللہ نے تمہیں رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی زوجیت کاجو شرف عطا فرمایا ہے اس کے وجہ سے تمہیں ایك امتیازی مقام حاصل ہے اور رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے طرح تمہیں بھی امت کے لیے ایك نمونہ بننا ہے چنانچہ انہیں ان کے مقام ومرتبے سے اگاہ کر کے انہیں کچھ ہدایت دی جارھی ہیں - اس کے مخاطب اگر چہ ازواج مطہرات ہیں جنہیں امہات المؤمنین قرار دیا گیا ہے لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا اور متنبہ کرنا ہے- اس لئے یہ ہدایت تمام مسلمان عورتوں کے لئے ہیں -

'অর্থাৎ তোমাদের মর্যাদা ও প্রকৃতি সাধারণ মহিলাদের মত নয়। বরং আল্লাহ্ তোমাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য প্রদান করেছেন। যার কারণে তোমরা এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়েছো এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মত তোমাদেরকেও উম্মাতের জন্য আদর্শ হতে হবে। এভাবে তাঁদের স্থান ও মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যদিও উপদেশের লক্ষ্যস্থল রাসূলের পবিত্র স্ত্রীগণ যাদেরকে উম্মাহাতুল মুমিনীন (মুমিনদের মা)-এর মর্যাদা দেয়া হয়েছে, কিন্তু বর্ণনা-ভঙ্গি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় মুসলিম উম্মাহ্র অন্তর্ভুক্ত সমস্ত নারীকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এজন্য এসব উপদেশ বা হিদায়াত সমস্ত মুসলিম মহিলার জন্যই প্রযোজ্য।'[২৯]

২৯. আল কুরআনুল কারীম, (উর্দূ), বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআনুল কারীম প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত, পৃ. ১১৭৭, সূরা আল আহযাব, টীকা-২।

www.amarboi.org

নিকাব ও খিমার শব্দের ব্যবহার

নিকাব (نقاب) : নিকাব শব্দের অর্থ– ঘোমটা, অবগুণ্ঠন, যা দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা হয়।[৩০] সমার্থে আরবীতে মুকান্না' (مقنع) শব্দটিও প্রচলিত রয়েছে। তবে মুকান্নার প্রচলিত অর্থ হচ্ছে– মুখোশ।[৩১] আল কুরআনে নিকাব শব্দটির প্রয়োগ নেই। অবশ্য হাদীসে শব্দটির প্রয়োগ এসেছে। এ শব্দটি মূলত খিমার (خِمَارٌ বহুবচনে خُمُرٌ) শব্দের এবং হিজাব শব্দের সমার্থে বা পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। যদিও নিকাব শব্দের চেয়ে খিমার এবং হিজাব শব্দদ্বয় আরও ব্যাপক অর্থবোধক।

খিমার (خمار) : খিমার শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী তাঁর বিখ্যাত তাফসীর রাওয়ায়িউল বায়ানে লিখেছেন–

ইবনু কাছীর বলেছেন– 'খুমুর' (خُمُرٌ) শব্দটি খিমার (خِمَارٌ) শব্দের বহুবচন। অর্থ– ঢেকে নেয়া। অন্য কথায় যা দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা হয়। লোকেরা সাধারণত যাকে মুকান্না (مُقَنَّعٌ) বা মুখোশ বলে অভিহিত করে থাকে। লিসানুল আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে– 'খুমুর' খিমার শব্দের বহুবচন। খিমার বলা হয় যা দিয়ে মহিলারা তাঁদের মাথা ঢেকে রাখেন। যেসব জিনিস দিয়ে ঢেকে রাখা হয় সেইসব জিনিসকেই মুখাম্মার (مُخَمَّر) বলা হয়। যেমন– হাদীসে বলা হয়েছে– خَمِّرُوْا أَنِيَتَكُمْ (তোমাদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখ)। মোটকথা, মহিলারা যে কাপড় দিয়ে তাদের মাথা ঢেকে রাখেন তাকেই 'খিমার' বলা হয়।[৩২] খিমার শব্দের সমার্থক বাংলা শব্দ হচ্ছে 'ওড়না'।

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ প্রথম দিকে হিজরাতকারিণী মহিলাদের উপর রহম করুন। কারণ আল্লাহ্ যখন এ আয়াত নাযিল করেন–

وَالْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ -

'আর তারা যেন তাদের 'খিমার' বা ওড়না দ্বারা তাদের বক্ষদেশ ঢেকে নেয়।'

তখন তারা তাদের পর্দার কাপড় ছিঁড়ে ওড়না বানিয়ে নেয়।[৩৩]

---

৩০. আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, পৃ. ৮৯৫।

৩১. রাওয়ায়িউল বায়ান তাফসীরু আয়াতুল আহকাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪।

৩২. রাওয়ায়িউল বায়ান তাফসীরু আয়াতুল আহকাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪।

৩৩. সুনানু আবূ দাউদ, হাদীস : ৪০৫৮ (ই. ফা)।

www.amarboi.org

জিলবাব ও হিজাব শব্দের ব্যবহার

জিলবাব (جِلْبَابٌ) এক বচনের শব্দ। বহুবচন- জালাবীব (جَلَابِيْبٌ)। জিলবাব বলা হয়- اَلثَّوْبُ الَّذِىْ يُسْتَرُهُ الْبَدَنَ (যে কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে রাখা হয়)।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), উবাদাহ্ (রা), কাতাদা (রহ), হাসান বসরী (রহ), সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহ), ইবরাহীম নাখঈ (রহ) ও আতা (রহ) এর মতে-

اَلْجِلْبَابُ هُوَ الرِّدَاءُ فَوْقَ الْخِمَارِ

'ওড়নার ওপর যে চাদর পরা হয় তাই জিলবাব।'

আব্দুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) বলেছেন-

اَلرِّدَاءُ الَّذِىْ يُسْتَرُ مِنْ فَوْقِ اِلَى اَسْفَلَ

'(জিলবাব হচ্ছে) এমন চাদর, যা শরীরের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঢেকে দেয়।'

আল কুরআনে বলা হয়েছে-

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط

'হে নবী! আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিন নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের চাদরের প্রান্ত তাদের ওপর টেনে দেয়।'[৩৪]

উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয়-

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

'মহিলারা যেন তাদের দেহকে চাদর দিয়ে আবৃত করে নেয়-'

তখন আনসার মহিলারা কালো কাপড়ে শরীর ঢেকে এমনভাবে বের হতো, মনে হতো তাদের মাথার ওপর কাক বসে আছে।[৩৫]

হিজাব (حِجَابٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ- আড়াল, অন্তরাল, প্রতিবন্ধকতা, যবনিকা, পর্দা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে- হিজাব হচ্ছে মহিলাদের রূপ-সৌন্দর্য,

৩৪. সূরা আল আহযাব, আয়াত-৫৯।

৩৫. সুনানু আবূ দাউদ, হাদীস : ৪০৫৭ (ই. ফা)।

www.amarboi.org

শরীরের গঠন প্রকৃতি, অলংকার, প্রসাধনী ইত্যাদি পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখা।

ঘরোয়া পরিবেশে ঘরের দেয়াল বা বেড়া, পর্দা, আলমারী ইত্যাদি হিজাব বা আড়াল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। নারীদের অবস্থান ও কর্মক্ষেত্র তার বাড়ি হলেও কোনো কোনো সময় বাইরে বের হবার একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। তখন প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বাইরে বের হতে পারবে না এমন কথা বলা হয়নি। প্রয়োজনটাকে সামনে রেখেই বাইরে বের হবার নীতিমালা দেয়া হয়েছে। বাইরের পরিবেশে যাতে পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখা যায় সেজন্য 'জিলবাব' ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেহেতু 'জিলবাব' দিয়ে হিজাব করা হয় তাই পরবর্তীতে 'জিলবাব' এর পরিবর্তে 'হিজাব' কথাটিরই প্রচলন হয়ে গিয়েছে।

বর্তমানে বোরকা, ওড়না এবং নিকাব যা কিছু ব্যবহার করা হয় তা মূলত: জিলবাব এর বিকল্প। অন্য কথায় বলা যায় জিলবাব এর আধুনিক রূপ হচ্ছে– হিজাব। আল্লামা আলুসী-এর বিশ্বখ্যাত তাফসীর রূহুল মাআনীতে বলা হয়েছে–

كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها

'মেয়েরা তাদের পরিধেয় কাপড়ের ওপর (পর্দা করার জন্য) যা পরে তা-ই জিলবাব।[৩৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম হিজাব শব্দের অর্থে জিলবাব শব্দের অর্থের চেয়ে ব্যাপকতা থাকলেও তা একই অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে সাধারণের কাছে জিলবাব এবং হিজাব পৃথক কোন শব্দ নয়, তারা দু'টোকে সমার্থক শব্দ হিসেবেই বেছে নিয়েছেন।

যাদের সামনে হিজাবের বিধান শিথিল করা হয়েছে

মুহাররাম বা মাহরাম বলতে বুঝায় যাদের সাথে নারীদের বিয়ে হারাম করা হয়েছে। আর যাদের সাথে বিয়ে বৈধ নয় তাদের সামনে সাজগোজ করে বেড়ানো দোষের নয়। এমনকি সতরের অতিরিক্ত অংশ তাদের সামনে ঢেকে রাখারও প্রয়োজন নেই। ইসলামী শরীআহ্তে যে হিজাবের কথা বলেছে এদের সামনে মহিলাদের সেই হিজাবের প্রয়োজন হয় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশ হচ্ছে–

৩৬. তাফসীর রূহুল মাআনী, খণ্ড.১২, পৃ. ৮৮।

www.amarboi.org

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآءِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُ عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص

'তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, তাদের পিতা, স্বামীর পিতা, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, মালিকানধীন ব্যক্তি, কামনাহীন অধীন পুরুষ ও নারীদের গোপন বিষয় বুঝে না এমন বালকের সামনে ছাড়া।'[৩৭]

অবশ্য এখানে এমন পাঁচ প্রকার লোকের কথাও বলা হয়েছে যাদের সামনে সাজসজ্জা প্রকাশ করা গেলেও তারা মাহরাম নয়। যেমন–

১. স্বামী, বিয়ের আগে তিনি গাইরি মাহ্‌রাম (অপরিচিত) থাকলেও বিয়ের পর হয়ে যান একান্ত আপন। মাহ্‌রাম আত্মীয়ের চেয়েও নিকটতম। তিনি এমন একজন, যার কাছে স্ত্রীর শরীরের কোনো অংশই গোপনীয় নয়।

২. ঘনিষ্ঠ স্ত্রীলোক, আরবী শব্দ হচ্ছে– نِسَائِهِنَّ (নিসা-ই-হিন্না), যার শাব্দিক অর্থ 'তাদের মহিলারা।' তাদের মহিলারা বলতে যাদের বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

ক. একদল বলেন, এখানে কেবল মুসলিম মেয়েদের কথা বলা হয়েছে। অমুসলিম মেয়েদের সামনে তেমনিভাবে হিজাব পালন করতে হবে যেভাবে পরপুরুষের সামনে হিজাব পালন করা হয়। ইবনুল আব্বাস, মুজাহিদ ও জুরাইজ এ মত পোষণ করেন।

খ. দ্বিতীয় দলের মতে, এখানে সকল নারীকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম রাযী মনে করেন এ মতটি ঠিক।

গ. তৃতীয় দলের মতে, যেসব নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা হয়, জানাশোনা আছে এবং যারা তাদের কাজকর্মে অংশ নেয় তাদের কথা বলা হয়েছে। তারা মুসলিমও হতে পারে আবার অমুসলিমও। অপরিচিত মহিলাদের যাদের

৩৭। সূরা আন নূর, আয়াত- ৩১।

www.amarboi.org

স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণের অবস্থা জানা নেই অথবা যাদের বাইরের অবস্থা সন্দেহজনক কিংবা যারা নির্ভরযোগ্য নয় তাদেরকে এ সীমার বাইরে রাখাই এর উদ্দেশ্য। এই মতটিই যুক্তিযুক্ত এবং কুরআনী শব্দের নিকটতর।[৩৮]

৩. মালিকানাধীন ব্যক্তি, একথাটির ব্যাখ্যা নিয়েও দুটো অভিমত পাওয়া যায়। ক. এর অর্থ এমন সব বাঁদী যারা কোনো মহিলার মালিকানাধীন রয়েছে। বাঁদী মুশরিক বা আহলি কিতাব যাই হোক না কেন মালিক মুসলিম মহিলা হলে সেজেগুজে তাদের সামনে আসতে পারে। কিন্তু মহিলা যদি বাঁদীর মনিব না হয়ে দাসের মনিব হয় তাহলে অবশ্যই তাকে দাস থেকে হিজাব মেনে চলতে হবে। দাস আর পরপুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনু সীরীন, সা'ঈদ ইবনু মুসায়্যিব, তাউস ও ইমাম আবু হানিফার এই মত। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে গোলামের জন্য তার মহিলা মালিক মুহাররাম নয়। যদি সে মুক্ত হয়ে যায় তাহলে আগের মহিলা মনিবকে বিয়ে করতে পারে। তাই গোলাম বা দাসের সাথেও হিজাব মেনে চলতে হবে। আয়াতের শব্দাবলীর অর্থ যদিও ব্যাপক তবু পরিবেশ পরিস্থিতি অর্থকে মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ করছে।

খ. এ আয়াতাংশের অর্থে বাঁদী ও দাস উভয়কেই বুঝিয়েছে। উম্মু সালামা (রা), আয়িশা (রা)সহ আহলে বাইতের অন্যান্য ইমামের অভিমত এটি। ইমাম শাফিঈ (রহ) এর একটি অভিমতও এর সপক্ষে রয়েছে। তাঁদের যুক্তি শুধু আয়াতাংশের ব্যাপক অর্থ থেকে নয় বরং তাঁরা সুন্নাতে রাসূল থেকেও এর সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসআদাতিল ফাযারী নামের এক দাসকে নিয়ে ফাতিমা (রা) এর বাড়িতে গিয়েছিলেন। তিনি তখন একটি ছোট চাদর গায়ে জড়িয়ে ছিলেন। মাথা ঢাকলে পা খালি থাকে আর পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ইতস্তত ভাব দেখে বললেন–

لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ اِنَّمَا هُوَ اَبُوْكِ وَغُلاَمُكِ.

'কোনো সমস্যা নেই, এখানে আছে তোমার আব্বা আর তোমার গোলাম।'

তাঁরা নবী (সা) এর এ বক্তব্য থেকেও যুক্তি পেশ করেন–

اذا كان لاحد اكن مكاتب وكان له ما يؤدى فلتحتجب منه ـ

'যখন তোমাদের কেউ তার গোলামের সাথে 'মুকাতাবাত' বা মূল্য পরিশোধের

৩৮। তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নূর। টীকা-৪৩

www.amarboi.org

বিনিময়ে মুক্তি দেবার লিখিত চুক্তি করে এবং সে চুক্তিকৃত মূল্য আদায় করার ক্ষমতা রাখে তখন তার সেই গোলাম থেকে হিজাব মেনে চলা উচিত।[৩৯]

৪. কামনাহীন অধীন পুরুষ, বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নিজের বয়স, শারীরিক দুর্বলতা, বুদ্ধির প্রতিবন্ধকতা, দারিদ্র্য ও অর্থহীনতা অথবা অন্যের পদানত বা গোলামীর কারণে গৃহকর্তার স্ত্রী, মেয়ে, বোন কিংবা মা সম্পর্কে কোনো কামনা কল্পনা করারও সাহস রাখে না।[৪০]

৫. যৌন জ্ঞানহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক।

মাহরাম হিসেবে যাদের তালিকা দেয়া হয়ছে তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থে তাদের বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। যেমন- اَبٌ (পিতা) এর বহুবচন اٰبَاءٌ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে এ শব্দটি দিয়ে বাপ, দাদা, দাদার বাপ এবং নানা ও নানার বাপও বুঝানো হয়েছে। স্বামীদের পিতা বলতে স্বামীর পিতা, দাদা, নানা এবং নানার পিতাও এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। নিজেদের ছেলে বলতে, ছেলে, নাতি, নাতির ছেলে সবাই, এ ব্যাপারে নিজের ও সতীনের সন্তানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ভাই বলতে, সহোদর, বৈমাত্রের এবং বৈপিত্রেয় সকল প্রকার ভাই-ই এ নির্দেশভুক্ত। ভাইবোনদের ছেলে বলতে, উপরোক্ত তিন ধরনের ভাইবোনের সন্তান ও তাদের পরবর্তী ধাপের সকল সন্তানকে বুঝানো হয়েছে।

এখানে চাচা, মামার কথা বলা না হলেও হাদীসে তাদেরকে মাহ্‌রাম বলা হয়েছে। দুধ-পিতা ও দুধ চাচাও মাহ্‌রামদের অন্তর্ভুক্ত।

মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা হিজাবের অংশ কিনা

আমরা আগেই বলেছি, হিজাব বলতে বর্তমানে যা বুঝায় তা মূলত জিলবাব (جلباب) এরই আধুনিক রূপ। তাই জিলবাব এর ব্যবহার সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে কী বলা হয়েছে সেদিকে একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক। ইরশাদ হচ্ছে–

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

৩৯. বিস্তারিত দেখুন- তাফহীমুল কুরআন। সূরা সূরা আন নূর, টীকা-৪৪।

৪০. তাফহীম, সূরা আন নূর, টীকা-৪৪।

www.amarboi.org

'হে নবী! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও ঈমানদার লোকদের স্ত্রীদের বলে দিন তারা যেন নিজেদের ওপর তাদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটি অতি উত্তম ব্যবস্থা। যেন তাদের চিনতে পারা যায় এবং এবং অযথা উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান।'[৪১]

আয়াতে উল্লেখিত জালাবীব (جلابيب) শব্দটি বহুবচন। একবচনে জিলবাব (جلباب)। জিলবাব (جلباب) এর ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী লিখেছেন–

هُوَ ثَوْبٌ اَكْبَرُ مِنَ الْخِمَارِ ـ

'জিলবাব' হচ্ছে এমন কাপড় যা ওড়নার চেয়ে বড়ো।' তারপর কুরতুবী বিভিন্ন জনের মত উল্লেখ করার পর উপসংহারে বলেছেন–

وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ ثَوْبُ الَّذِىْ يَسْتُرُ جَمِيْعَ الْبَدَنِ ـ

'সারকথা হচ্ছে 'জিলবাব' এমন একটি কাপড় যা দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা হয়।'[৪২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) বলেন–

جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں – اور ادناء کے اصل معنی قریب کر نے اور لپیٹ لینے کے ہیں مگر جب اس کے ساتھ "علیٰ" کا صلہ آئے تواس میں اِرْخَاءُ یعنی اوپر سے لٹکا لینے کا مفہوم پیدا ہوجاتا ہے – موجودہ زمانے کے بعض مترجمین ومفسرین مغربی مذاق سے مغلوب ہوکر اس لفظ کا ترجمہ صرف "لپیٹ لینا" کر تے ہیں تاکہ کسی طرح چہرہ چھپانے کے حکم سے بچ نکلا جائے لیکن اللہ تعالی کا مقصود اگر وہی ہوتا جو یہ حضرت بیان کرنا چا ہتے ہیں تووہ یُدْنِیْنَ اِلَیْھِنَّ فرماتا – جو شخص بھی عربی زبان جانتا ہو وہ کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ یُدْنِیْنَ عَلَیْھِنَّ کے معنی محض لپیٹ لینے کے ہو سکتے ہے – مزید

৪১. সূরা আল আহযাব, আয়াত : ৫৯।

৪২. আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন, (তাফসীর কুরতুবী), ৭ম জিল্‌দ, খণ্ড-১৪, পৃ. ২৫৬।

www.amarboi.org

برآں مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ کے الفاظ یہ معنی لینے میں اور زیادہ مانع ہیں - ظاہر ہے کہ یہاں مِنْ تبعیض کے لئے ہے یعنی چادر کا ایک حصّہ - اور یہ بھی ظاہر ہے کہ لپٹی جائے گی تو پوری چادر لپٹی جائے گی نہ کہ اس کا محض ایک حصّہ - اس لیے آیت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ عورتیں اپنی چادریں اچھی طرح اوڑھا لپیٹ کران کا ایک حصّہ یا ان کا پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں، جسے عرف عام میں گھو نگھٹ ڈالنا کہتے ہیں -

'আরবী ভাষায় 'জিলবাব' বলা হয় বড়ো চাদরকে। আর ইদনা (ادناء)[৪৩] শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে নিকটবর্তী করা ও ঢেকে নেয়া। কিন্তু যখন তার সাথে আলা (على) অব্যয় (Preposition) বসে তখন তার মধ্যে ইরখা (ارخاء) অর্থাৎ ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেয়ার অর্থ সৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগের কোন কোন অনুবাদক ও তাফসীরকার পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে এ শব্দের অনুবাদ করেন শুধু 'জড়িয়ে নেয়া' যাতে চেহারা কোনোভাবে ঢেকে রাখার হুকুমের বাইরে থেকে যায়। কিন্তু তারা যা বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য যদি তাই হতো তাহলে তিনি يُدْنِيْنَ اِلَيْهِنَّ বলতেন। যে ব্যক্তিই আরবী ভাষা জানেন তিনি কখনও একথা মেনে নিতে পারেন না যে, يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ মানে কেবল জড়িয়ে নেয়া হতে পারে। তাছাড়া مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ শব্দ দুটি এ অর্থ গ্রহণ করার পথে আরো বেশি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে মিন (من) শব্দটি 'কিছু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ চাদরের এক অংশ। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, জড়িয়ে নিতে হলে পুরো চাদর জড়াতে হবে, নিছক তার একটা অংশ নয়। তাই আয়াতের পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে– নারীরা যেন নিজেদের চাদর ভালোভাবে জড়িয়ে শরীর ঢেকে নেয় এবং তার একটি অংশ বা একটি পাল্লা নিজেদের ওপর লটকে দেয়, প্রচলিতভাবে যাকে ঘোমটা বলা হয়।'[৪৪]

আল্লামা আবু বাকর আল জাসসাস বলেছেন–

فی هذه الاية دلالة على ان المرأة الشهابة مأمورة بستر

৪৩. ادناء শব্দের ক্রিয়ামূল হচ্ছে يدنين -

৪৪. তাফহীমুল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, সূরা আহযাব, টীকা-১১০।

www.amarboi.org

وجهها عن الاجنبين واظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع اهل الريب فيهن -

'এ আয়াতটি প্রমাণ করে, যুবতী মেয়েদের চেহারা অপরিচিত পুরুষদের থেকে লুকিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে বাড়ি থেকে বের হবার সময় তাদের সতর ঢেকে পবিত্রতার প্রকাশ ঘটানো উচিত। যাতে সন্দেহযুক্ত চরিত্র ও কর্মের অধিকারী পুরুষরা তাদের দেখে কোনো প্রকার যৌন উত্তেজনা অনুভব না করে।'[৪৫]

আল্লামা যামাখশারী বলেছেন–

"يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ، يعنى وه اپنے اوپراپنى چادروں كا ايك حصّه لٹكا ليا كريں اوراس سے اپنے چهرے اور اپنے اطراف كو اچهى طرح ڈهانك ليں - (الكشاف - جلد ٢، ص ٢٢١)

'অর্থাৎ তারা যেন নিজেদের ওপর তাদের চাদরের একটি অংশ ঝুলিয়ে দেয় এবং তার সাহায্যে নিজেদের চেহারা ও প্রান্তভাগগুলো ভালোভাবে ঢেকে নেয়।'[৪৬]

সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনুল আব্বাস (রা)-এর এক ভাষ্য ইবনু কাছীর তাঁর তাফসীরে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে–

قال ابن عباس : امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن فى حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة -

'ইবনুল আব্বাস (রা) বলেছেন– আল্লাহ্ মুসলিম মহিলাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যদি প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতে হয় তাহলে জিলবাব (বা বড় চাদর) দিয়ে এমনভাবে মাথার ওপর থেকে মুখমণ্ডল ঢেকে নেবে, যেন শুধু একটি চোখ খোলা থাকে।'[৪৭]

তাফসীর ইবনু কাছীরে আরও বলা হয়েছে–

---

৪৫. আহকামুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৮।

৪৬. তাফসীর আল কাশশাফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১ এর রেফারেন্সে তাফহীমুল কুরআন। ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩০।

৪৭. মুখতাসার তাফসীর ইবনু কাছীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৪, তাফসীর আল মাযহারী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৬।

www.amarboi.org

قال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلمانى عن قول اللّه عز وجل : يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ - فغطى وجهه ورأسه وابرز عينه اليسرى -

'মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, আমি উবাইদা আস সালমানীর কাছে প্রশ্ন করেছিলাম– আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা যে বলেছেন–

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ -

একথার তাৎপর্য কী? (একথা শোনে তিনি) তাঁর মুখমণ্ডল, মাথা এমনভাবে ঢেকে নিলেন যে শুধু বাম চোখটি খোলা রাখলেন।'[৪৮]

তাফসীর রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে–

فَرَفَعَ مِلْحَفَةً كَانَتْ عَلَيْهِ فَتَقَنَّعَ بِهَا وَغَطَّى رَأْسَهُ كُلَّهُ حَتَّى بَلَغَ الْحَاجِبِيْنَ وَغَطَّى وَجْهَهُ وَاَخْرَجَ عَيْنَهُ الْيُسْرَى مِنْ شِقِّ وَجْهِ الْاَيْسَرَ -

'তিনি নিজের গায়ের চাদরটি দিয়ে তার সমস্ত মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নিলেন এবং বাম চোখটি খোলা রেখে দিলেন।'[৪৯]

বর্তমান সময়ের প্রখ্যাত গবেষক আল্লামা মুহাম্মাদ আলী আস সাবূনী তাঁর বিখ্যাত তাফসীর রাওয়ায়িউল বায়ান তাফসীর আয়াতুল আহকামে বলেছেন–

ظهرت فى هذه الأيام الحديثة، دعوة تطورية جديدة، تدعو المرأة إلى أن تسفر عن وجهها، وتترك النقاب الذى اعتادت أن تضعه عند الخروج من المنزل، بحجة أن النقاب ليس من الحجاب الشرعى - وأن الوجه ليس بعورة - دعوة (تجددية) من أناس يريدون أن يظهروا بمظهر الأئمة المصلحين الذين

৪৮. মুখতাসার তাফসীর ইবনু কাছীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৪।

৪৯. তাফসীর রুহুল মাআনী, তাফসীর তাবারী।

www.amarboi.org

يبعثهم الله على رأس كل مائة سنة ليجددوا للأمة أمر دينها، ويبعثوا فيها روح التضحية، والإيمان، والكفاح -

دعوة جديدة، وبدعة حديثه من أناس يدعون العلم، ويزعمون الاجتهاد ويريدون أن يثبتوا بآرائهم (العصرية الحديثة) أنهم أهل لأن ينافسوا الأئمة المجتهدين وأن يجتهدوا فى الدين كما اجتهد أئمة المذاهب ويكون لهم أنصار وأتباع -

لقد لاقت هذه الدعوة (بدعة كشف الوجه) رواجًا بين صفوف كثير من الشباب وخاصة منهم العصريين، لا لأنها (دعوة حق) ولكن لأنها تلبى داعى الهوى، والهوى محبب إلى النفس -

'সাম্প্রতিক কালে আধুনিক ও প্রগতিশীল দাবীদার কিছু লোক মহিলাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখার ব্যাপারে নারীদের উদ্বুদ্ধ করছে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় নিকাব পরিত্যাগ করার মত নোংরা কাজে তাদের অভ্যস্ত করাতে চাচ্ছে। তারা যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে নিকাব শরঈ হিজাব এর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং মুখমণ্ডল সতরের অংশ নয়। সংস্কারক ইমাম (মুজাদ্দিদ) যাঁদের আল্লাহ্ প্রতি শতাব্দীর শীর্ষ ভাগে পাঠিয়ে থাকেন, তাঁরা উম্মাতকে দীনি নির্দেশাবলীর সঠিক পদ্ধতি বাতলে দেন। আত্মত্যাগ, ঈমান ও সংগ্রামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। কতিপয় সংস্কারবাদী (?) নিজেদের সেই রকম সংস্কারক মনে করেন।

প্রগতিশীল দাবীদার আধুনিক বিদআত-পন্থী যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড়াই করে তাদের ধারণা যুগোপযোগী গবেষণার জন্যই তাদের পাঠানো হয়েছে। তারাই এ কাজের উপযুক্ত। তাই তারা মুজতাহিদ (গবেষক) ইমামদের সমকক্ষতা অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে এবং তারা যেমন দীনের জন্য গবেষণা করেছেন, দীনের কল্যাণ করেছেন, দীনকে অনুসরণ উপযোগী বানিয়েছেন সেই রকম ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে চায় এবং তাদের অনুসারী ও সাহায্যকারী হতে চায়।

মুখমণ্ডল খোলা রাখার বিষয়টি তারা রেওয়াজে পরিণত করতে চায়। যুবশ্রেণীর

www.amarboi.org

মধ্যে বিরাট একটিদল বিশেষ করে যারা আধুনিক মন মানসের অধিকারী তারা এ বিষয়টি লুফে নিচ্ছে। এ কারণে নয় যে, তা সঠিক পথ নির্দেশনা। বরং তারা প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। আর মানুষের কাছে প্রবৃত্তি পছন্দনীয় জিনিস।'[৫০]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেছেন–

'এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকেরা যেন জানতে পারে এরা দুশ্চরিত্রা মেয়ে নয়। কারণ সতরের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও যে মেয়েটি নিজের চেহারা ঢেকে রাখবে তার কাছে কেউ আশা করতে পারে না যে, সে নিজের সতর অন্যের সামনে খুলতে রাজি হবে। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে এ মেয়েটি পর্দানশীন, একে ব্যভিচারে লিপ্ত করার আশা করা যেতে পারে না।'[৫১]

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় মহিলারা যখন বাড়িতে অবস্থান করবে তখন সতর ঢেকে রাখার অতিরিক্ত কাপড় হিসেবে ওড়না ব্যবহার করবে। আর যখন প্রয়োজনে বাইরে বের হবে তখন জিলবাব (جلباب) ব্যবহার করতে হবে। আর এ জিলবাবটি ব্যবহার করতে হবে সতর ঢেকে রাখার জন্য যে পোশাক পরা হয় তার ওপর দিয়ে। সেই সাথে মুখমণ্ডলও ঢেকে নিতে হবে।

বর্তমানে জিলবাব বা বড়ো চাদরের পরিবর্তে আধুনিক ডিজাইনের বোরকা ব্যবহার করা হয়। বোরকা আবার কেউ কেউ স্কার্ফ এবং নিকাব দিয়ে ব্যবহার করেন। আবার অনেকে শুধু স্কার্ফ ব্যবহার করলেও পেঁচিয়ে নিকাবের মত করে মুখমণ্ডল ঢেকে নেন। আবার কেউ কেউ মুখমণ্ডল খোলা রেখে স্কার্ফ ব্যবহার করেন এবং নিকাব ব্যবহার করেন না। কিন্তু ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে জিলবাব বা বোরকা যা-ই ব্যবহার করা হোক না কেন মুখমণ্ডল ঢেকে নিতে হবে। কাজেই যারা মুখমণ্ডল খোলা রাখেন তারা পরিপূর্ণভাবে হিজাব পালন করছেন না, একথা তো বলা যেতেই পারে। তাছাড়া হিজাব এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে, আল কুরআনের যেসব আয়াত এবং সুন্নাতে রাসূল থেকে যেসব হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে সেখানেও হিজাব বলতে এমন কিছুকে বুঝানো হয়েছে যার ভেতর দিয়ে দর্শনীয় কিছু দেখা সম্ভবপর নয়।

---

৫০. তাফসীর রাওয়ায়িউল বয়ান ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭১।

৫১. তাফসীর কাবীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১।

www.amarboi.org

মুখমণ্ডল খোলা রাখা না রাখার ব্যাপারে যে বিভ্রান্তি, তার উৎস কোথায়

মুখমণ্ডল বা চেহারা হিজাব এর অন্তর্ভুক্ত কিনা এ নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। কারণও একটি নয়, বেশ কয়েকটি। সেই কারণগুলো এবার আমরা উল্লেখ করবো এবং পর্যায়ক্রমে তার আলোচনা করার চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ্।

প্রথম কারণ ঃ সতর ও হিজাবের পার্থক্য না করা

সতর ও হিজাব এর মধ্যে পার্থক্য না করা। কোন কোন তাফসীর পড়লে মনে হয় তারা উভয় নির্দেশকে একাকার করে ফেলেছেন। ফলে তারা মুখ ঢেকে রাখাকে হিজাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না।

দ্বিতীয় কারণ ঃ হিজাব নবীপত্নীদের জন্য নির্দিষ্ট মনে করা

সকল মুসলিম মহিলার জন্য 'সতর' আবশ্যক মনে করা কিন্তু 'হিজাব' নবীপত্নী বা উম্মাহাতুল মুমিনীনের জন্য নির্দিষ্ট মনে করা। কিংবা হিজাব সব ঈমানদার মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করা হলেও চেহারা হিজাব এর অন্তর্ভুক্ত নয় বলে মনে করা। এ সম্পর্কেও আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। চেহারা ও সৌন্দর্য 'হিজাব' এর অন্তর্ভুক্ত। ভিন পুরুষের সামনে তা খোলা রাখা যাবে না।

তৃতীয় কারণ ঃ সূরা আন নূরের ৩১ নং আয়াতের পরস্পর বিপরীতমুখী ব্যাখ্যা

সূরা আন নূরের ৩১ নম্বর আয়াতের পরস্পর বিপরীতমুখী ব্যাখ্যা প্রদান। অন্য কথায় বলা যায় তাফসীরকারগণের সূরা আন নূর এবং সূরা আল আহযাব এর সতর ও হিজাব (পর্দা) সংক্রান্ত আয়াতসমুহের মধ্যে সমন্বয় করত: ব্যাখ্যা প্রদান না করা। যারা বিভিন্ন তাফসীর অধ্যয়ন করে থাকেন তাঁরা আমার এ কথার তাৎপর্য আশা করি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণ দ্বিধাবিভক্ত। আয়াতাংশ হচ্ছে–

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ـ

'আর তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে এমনিই যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে তার কথা ভিন্ন।'[৫২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আতিয়া (মৃত্যু : ৫৪৬ হি.) তাঁর তাফসীর 'আল মুহাররিরুল ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবি আযীয'-এ লিখেছেন–

ثم استثنى ما يظهر من الزينة، فاختلف الناسُ فى قدر ذلك

৫২. সূরা আন নূর, আয়াত : ৩১।

www.amarboi.org

ـ فقال ابن مسعود رضى اللّه عنه : ظاهر الزينة هو الثياب، وقال سعيد بن جبير : الوجه الثياب، وقال سعيد بن جبير أيضاً، وعطاءٌ، والاَوزاعى : الوجه والكفان الثياب، وقال بن عباس رضى اللّه عنهما، وقتادة، والمسوربن مخرمة (١) : ظاهر الزينة هو الكحل والسِّواك والخضابُ اِلى نصف الذراع والقِرَاطةُ وَالْفَتَحُ (٢)، ونحو هذا فمباح اَنْ تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس، وذكر الطبرى عن قتادة فى معنى نصف الذراع حديثًا عن النبى صلى اللّه عليه وسلم (٣) ، وذكر اخر عن عائشة رضى اللّه عنها، عن النبى صلى اللّه عليه وسلم(٤) ـ

قال القاضى أبو محمد رحمه اللّه : ويظهر لى بحكم الفاظ الآية أنْ المرأة مأمورة بألا تبدى، واَن تجتهد فى الاخفاء لِكل ما هو زينة، ويقع الاستثناءُ فى كل ماغلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو اصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفى عنه، فغالب الأمر أن الوجه وَالكفين يكثر منهما الظهور، وهو الظاهر فى الصلاة، ويحسن (١) بالحسنة الوجه اَنْ تستتر اِلا من ذى حرمة محرمة، ويحتمل لفظ الآية اَنْ الظاهر من الزينة لها اَنْ تبديه، ولكن يقوى ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس، فلا يظن اَنْ يباح للنساءِ من اِبداء الزينة اِلاَّ ما كان بذلك الوجه، واللّه الموفق للصواب برحمته.

www.amarboi.org

'অর্থাৎ সৌন্দর্য থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয় তাকে পৃথক রাখা হয়েছে। তবে আয়াতে কতটুকু প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে তার পরিমাণ সম্পর্কে মনীষীগণ মতবিরোধ করেছেন।

* ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, প্রকাশ্য সৌন্দর্য হচ্ছে কাপড়।

* সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহ) বলেন, চেহারা এবং কাপড়।

* সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহ)-এর আরেক বর্ণনা, আতা (রহ) এবং আওযায়ী বলেন– চেহারা, দু'হাতের তালু এবং কাপড়।

* ইবনুল আব্বাস (রা), কাতাদাহ্ ও মিসওয়ার ইবনু মাখরামা বলেন– প্রকাশ্য সৌন্দর্য হচ্ছে, সুরমা, বালা ও হাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত রঙের কারুকাজ, কানের দুল, গলার হার ইত্যাদি। পুরুষদের মধ্য থেকে যারাই মেয়েদের কাছে যাবে তাদের সামনে এগুলো প্রকাশ করা মুবাহ্।

* কাযী আবু মুহাম্মাদ বলেন– আমাদের কাছে আয়াতের নির্দেশ সুস্পষ্ট। মেয়েদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং সৌন্দর্যের সবকিছুকে গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তারপরও যা কিছু অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা এ নির্দেশের বাইরে রাখা হয়েছে। এই নির্দেশের ফলে জরুরী প্রয়োজনে চলাচলের সময় অর্থাৎ কাজ-কর্ম সম্পাদনের সময় যা কিছু প্রকাশিত হয়ে পড়বে তা ক্ষমার যোগ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাতের তালু ও চেহারা প্রকাশ করতে হয়। তবে উত্তম হচ্ছে মুহাররাম আত্মীয় ছাড়া অন্যদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ না করা। সতর্কতাবশত লোকদের ফিতনা ফাসাদ থেকে রক্ষার জন্য তা ঢেকে রাখা উত্তম।'[৫৩]

আবু বাকর আল জাস্সাস (মৃত্যু : ৩৭০ হি.) তাঁর তাফসীর– আহকামুল কুরআনে লিখেছেন–

فى قوله تعالى : (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) : روى عن ابن عباس، وعطاء فى معنى هذه الآية أن ما كان فى الوجه والكف من خضاب او كحل فهو من ما ظهر من الزينة، وعن ابن عمر مثله، ورُوى عن ابن عباس ايضًا ان ما

৫৩. তাফসীর ইবনু আতিয়াহ্, দশম খণ্ড, পৃ. ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯।

www.amarboi.org

ظهر من الزينة الكف الوجه والخاتم ـ وقالت عائشة ـ رضى اللّه عنها ـ الزينة الظاهرة : القلب والفتخة ـ وقال ابو عبيدة : الخاتم ـ وقال الحسن : وجهها وما ظهر من ثيابها ـ وقال سعيد بن المسيب : وجهها مما ظهر منها ـ وروى ابو الاحوص عن عبد اللّه قال : الزينة زينتان : زينة باطنة لا يراها الا الزوج وهى الاِكليل والسوار والخاتم ـ واما الظاهرة فالثياب. وقال ابراهيم : الزينة الظاهرة الثياب ـ وقال اصحابنا ـ اى الحنفية : المراد بالزينة الظاهرة التى يجوز ابداؤها الوجه والكفّان، لان الكحل زينة الوجه، والخضاب والخاتم زينة الكف، فاذا اباح النظر الى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة اباحة النظر الى الوجه والكفين ـ ويدل على ان الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة ايضًا انها تصلى مكشوفة الوجه واليدين، فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة، واذا كان كذلك جاز للاجنبى ان ينظر من المرأة الى وجهها ويديها بغير شهوة، فاذا كان يشتهيها اذا نظر اليها جاز ان ينظر لعذر مثل ان يريد تزوجها

*ইবনুল আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও আতা (রহ) মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করে الا ما ظهر (সাধারণত যা প্রকাশিত হয়) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হচ্ছে– চেহারা ও হাতের তালুতে যা ব্যবহার করা হয় যেমন রং ও সুরমা।

* ইবনু উমার (রা) ও অনুরূপ কথা বলেছেন।

* আনাস (রা) ও ইবনুল আব্বাস (রা) বলেছেন, হাতের তালু, চেহারা ও আংটি।

www.amarboi.org

* আয়িশা (রা) বলেছেন, প্রকাশ্য সৌন্দর্য হচ্ছে আংটি, স্বর্ণ বা রূপার বালা।

* হাসান বসরী (রহ) বলেছেন, চেহারা ও পোশাকের সাহায্যে যা প্রকাশ পায়।

* সাইয়্যিদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ) বলেন, চেহারা থেকে যা প্রকাশ পায়।

* আবুল আহওয়াস আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, সাজসজ্জা দু ধরনের। এক. গোপন সাজসজ্জা যা স্বামী ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পারে না। যেমন, হার, বালা, আংটি। দুই. পোশাক।

* ইবরাহীম নখঈ (রহ) বলেন, প্রকাশ্য সৌন্দর্য হচ্ছে, পোশাক।

* হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ বলেন, এর অর্থ চেহারা ও হাতের তালু। কেননা সুরমা চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং এটি এক ধরনের রঙ আর আংটি হাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, যে কারণে চেহারা ও হাতের তালুর সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া বৈধ করা হয়েছে। এতে আরও প্রমাণিত হয়, চেহারা ও হাতের তালু সতরের অংশ নয় বলে মহিলারা দুহাত ও চেহারা খোলা রেখে নামায পড়বে। যদি এ দুটো সতরের অংশ হতো তাহলে যেভাবে সতর ঢাকা ফরয সেভাবে এ দুটো ঢেকে রাখাও ফরয হতো। গাইরি মুহাররাম লোকদের জন্য মেয়েদের চেহারা ও হাত কোনো প্রকার যৌন কামনা ছাড়া দেখা জায়েয। যদি দৃষ্টিতে যৌন কামনা থাকে তবু ওজরবশত তা দেখা যাবে। যেমন বিয়ের উদ্দেশ্যে তাকে দেখা জায়েয।'[৫৪]

ইমাম কুরতুবীর (মৃত্যু : ৬৭১ হি.) তাফসীর আল জামিউল আহকামুল কুরআনে বলা হয়েছে–

ثم امر الله تعالى النساء بان لا يبدين زينتهن للناظرين - ثم استثنى ما يظهر من الزينة، واختلف الناس فى قدر ذلك ..... لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك فى الصلاة والحج، فيصلح ان يكون الاستثناء راجعًا اليهما۔

'আল্লাহ্ ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য নারীদের নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন লোকদের সামনে তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। এ আয়াতের শেষাংশে যেটুকু তিনি প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন সেটুকু ছাড়া। তবে যে সাজসজ্জা আপনা আপনি

৫৪. আহকামুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৫।

www.amarboi.org

প্রকাশিত হয়ে যায় এবং যাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রেখেছেন তার পরিসীমার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। .....যখন অধিকাংশ সময় মুখ ও হাতের তালু স্বাভাবিকভাবে ও ইবাদাতের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নামাযের ও হাজ্জের সময় প্রকাশ করা হয়, তখন 'নিষেধাজ্ঞার বাইরে' কথাটি হাত ও চেহারার দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়াই অধিক যুক্তি সংগত।'[৫৫]

ওপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে বুঝা গেল যারা মুখমণ্ডল খোলা রাখতে চান তাদের যুক্তিগুলো কী কী। ইবনুল আব্বাস (রা)-এর একটি বক্তব্য যা পরবর্তী তাবিঈ ও তাবি তাবিঈগণ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে সূরা আল আহযাবের তাফসীরে এর উল্টো বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। যা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এবার দেখা যাক যারা চেহারা ঢেকে রাখার পক্ষে বলেছেন তাদের যুক্তি কী কী। ইবনু কাছীরের (মৃত্যু : ৭৭৪ হি.) তাফসীর আল কুরআনুল আযীমে বলা হয়েছে–

وقوله تعالى : (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) اى لا يظهرن شيئًا من الزينة للاجانب الا مالا يمكن اخفاؤه ـ قال ابن مسعود : كالرداء والثياب يعنى على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابها وما يبدو من اسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه لان هذا لا يمكنها اخفاؤه ونظيره فى زي النساء ما يظهر من ازارها وما لا يمكن اخفاؤه ـ وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وابو الجوزاء وابراهيم النخعى وغيرهم ـ

..... عن عبد اللّه قال فى قوله (ولا يبدين زينتهن) الزينة القرط والدملوج والخلخال والقلادة ـ وفى رواية عنه بهذا الاسناد قال : الزينة زينتان : فزينة لا يراها الا الزوج :

৫৫. তাফসীর কুরতুবী, একাদশ খণ্ড, পৃ. ২২৮-২২৯।

www.amarboi.org

الخاتم والسوار، وزينة يراها الاجانب وهى الظاهر من الثياب ـ وقال الزهرى لا يبدين هؤلاء الذين سمى اللّه ممن لا تحل له الا الاسورة والاخمرة والاقرطة من غير حسر واما عامة الناس فلا يبدين منها الا الخواتم ـ

وقال مالك عن الزهرى (الا ما ظهر منها) الخاتم والخلخال ـ

'অর্থাৎ তাদের রূপ সৌন্দর্যের কোনো অংশই যেন পর পুরুষের সামনে প্রকাশ না করে। তবে যা গোপন রাখা নিতান্তই কষ্টসাধ্য তা ছাড়া।

* ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, যেমন, চাদর ও কাপড়। আরবের মহিলারা এমন ওড়না পরিধান করতো যাতে ব্যবহৃত কাপড় ঢেকে যেত। তবু কাপড়ের নিচের অংশ যা দৃষ্টিগোচর হতো সেজন্য আপত্তি করা হয়নি। কেননা তা আবৃত রাখা সম্ভব নয়। যেমন, পাজামার নিচের অংশ যা ঢেকে রাখা সম্ভব হয় না। হাসান বসরী, ইবনু সীরীন, আবুল জাওযা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখের অভিমতও তাই। .....

* আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে আরেক বর্ণনায় আছে– মহিলাদের যে সৌন্দর্য প্রদর্শনে নিষেধ করা হয়েছে তা হচ্ছে কানের দুল, ওড়না, নুপুর, গলার হার ইত্যাদি। একই সনদে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে আরও বলা হয়েছে, সৌন্দর্য দুপ্রকার। এক. এমন সৌন্দর্য যা স্বামী ছাড়া আর কেউ দেখতে পারেন না, যেমন, আংটি বালা ইত্যাদি। দুই. এমন সৌন্দর্য যা পর পুরুষও দেখতে পারে। যেমন– কাপড়ের বাহ্যিক অংশ।

* ইমাম যুহ্‌রী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে মুহার্‌রাম বলে উল্লেখ করেছেন তারা সাধারণত চুড়ি, কানের দুল ইত্যাদি দেখতে পারে কিন্তু গাইরি মুহার্‌রাম (পরপুরুষ) যারা তারা কেবল আংটি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পারবে না।

* মালিক (রহ) যুহ্‌রী থেকে বর্ণনা করেন, إِلَّا مَا ظَهَرَ বলতে আংটি এবং নুপুরের কথা বুঝানো হয়েছে।'[৫৬]

আল্লামা বাইযাভী (মৃত্যু : ৬৫৮ হি.) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন–

৫৬. তাফসীর ইবনু কাছীর, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১২।

www.amarboi.org

والاظهر ان هذا فى الصلاة لا فى النظر، فان بدن الحرة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة

'এটা স্পষ্ট যে, এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে নামাযের জন্য। দেখার জন্য নয়। কেননা স্বাধীন মহিলাদের সারা শরীরই সতর। স্বামী বা মাহ্‌রাম ছাড়া তাদের শরীরের কোনো অঙ্গের দিকে তাকানো হালাল (বৈধ) নয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জায়েয। যেমন– চিকিৎসা গ্রহণের ও সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে।'[৫৭]

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী তাঁর তাফসীর তাদাব্বুরে কুরআনে লিখেছেন–

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا – زینت کی چیزوں میں لباس بھی داخل ہے اور زیورات بھی – ان میں سے ہر چیز کو نہ تو چھپانا ممکن ہے نہ ہر چیز کا ظاہر ہونا ناگزیر ہے – لباس کا بھی ظاہری حصّہ بہر حال ظاہر ہو کے رہےگا اور زیورات بھی بالخصوص ہاتھ کے بعض زیورات بغیر زحمت کے نہیں چھپائےجا سکتے – اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کے استثناء نے اس قسم کی غیر معمولی زحمتوں سے بچاکر صرف ان زینتوں کو چھپانے کی ہدایت فرمائی جن کے چھپانے میں زیادہ زحمت نہیں ہے –

'সৌন্দর্যোপকরণ হিসেবে পোশাক ও অলংকার উভয়টিই গণ্য হয়। এর মধ্যে কিছু জিনিস গোপন রাখা সম্ভব নয় আবার কিছু জিনিস প্রকাশ না হয়েও পারে না। পোশাকের বাইরের অংশ সবসময় প্রকাশ হয়েই থাকে। আবার অলংকারসমূহ বিশেষ করে হাতে ব্যবহার করা হয় এমন কিছু অলংকার গোপন রাখা খুবই কষ্টকর। اِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا বলে সেই রকম কষ্টসাধ্য কিছু সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা স্বতঃই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এবং যা গোপন রাখা বেশ কষ্টকর।'[৫৮]

আল্লামা ইদরীস কান্দালভী তাঁর তাফসীর মা'আরিফুল কুরআনে বলেছেন–

---

৫৭. তাফসীর আল বাইযাভী, ২/৫৮ এর রেফারেন্সে তাফসীর আল মাযহারী। ৭/৪৯৪।

৫৮. তাদাব্বুরে কুরআন– আমীন আহসান ইসলাহী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭।

www.amarboi.org

یہ کہ پہلی آیت وَلَایُبْدِیْنَ زِیْنَتَھُنَّ اِلاَّ مَا ظَھَرَ میں ستر اور کشف عورت کے مسئلہ کا بیان تھا کہ عورت کو فی حد ذاتہ کن مواضع زینت اور کن اعضاء کا کھلا رکھنا جائز ہے اور کن اعضاء کا چھپانا واجب ہے اور اس کے بعد والی آیت یعنی وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَھُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِھِنَّ الخ یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت کو کس کے سامنے آنا جائز ہے - سو بتلا دیا کہ سوائے محارم کے کسی کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا قطعًا حرام ہے اور حکم سابق سے جن صورتوں کو مستثنے فرمایا وہ بارہ ہیں - خلاصہ یہ کہ جن سے نکاح جائز ہے وہ سب اجنبی کے حکم میں ہیں - پھر یہ کہ شوہر کے سوا دیگر محارم کے سامنے آنے کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو - اگر فتنہ کار ندیشہ ہو تو پھر محارم کے سامنےآنا بھی ناجائز ہو جائیگا اور شوہر طلاق دینے کے بعد اجنبی مرد کے حکم میں ہوجاتا ہے - شہوت کے ساتھ تو ماں بیٹی کی طرف بھی نظر کرنا حرام ہے -

'আয়াতের প্রথম দিকে وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَھُنَّ اِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا বলে মহিলাদের সতর ও পর্দার মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে। মহিলাদের রূপ সৌন্দের্যের সীমা কতটুকু। সাজসজ্জার স্থান কী কী এবং শরীরের কতটুকু খোলা রাখা জায়েয আর শরীরের কতটুকু অংশ ঢেকে রাখা আবশ্যক। অতঃপর আয়াতের পরবর্তী অংশে وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَھُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِھِنَّ হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এই মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহিলারা কাদের সামনে দেখা দিতে পারবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কজন মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্যদের সাথে নিজের চেহারা খোলা রাখা অকাট্যভাবে হারাম। যাদের সামনে খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে তারা মাত্র বারো ধরনের পুরুষ। মোট কথা যাদের সাথে বিয়ে জায়েয তারা সবাই বেগানা বা পরপুরুষের অন্তর্ভুক্ত। তারপরও স্বামী ছাড়া অন্য মাহ্‌রাম পুরুষদের সাথে দেখা দেয়ার শর্ত হচ্ছে যদি ফিতনা বা কোন প্রকার বিপর্যয়ের আশংকা না থাকে। থাকলে মাহ্‌রাম পুরুষদের সাথেও দেখা দেয়া জায়েয নয়। স্বামী যদি

www.amarboi.org

তালাক দেন, তাহলে তালাক দেয়ার পর স্বামীও পরপুরুষের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। মা অথবা মেয়ের প্রতিও কামনার দৃষ্টিতে তাকানো হারাম।'[৫৯]

এরপর তিনি অগ্রসর হয়ে আরও বলেন–

یہاں تک اللّٰہ تعالی نے زنا سے حفاظت کی چار تدبیر بتلا ئیں – اب آ گے پانچویں تدبیر بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایمان والی عورتوں کوچاہیے کہ پردہ کا اس درجہ اہتمام کریں کہ چلنے کی حالت میں اپنے پیرزمین پر زور سے نہ ماریں تاکہ ان کا پوشیدہ زیور لوگوں کو معلوم ہو جائے زجاج کہتے ہیں کہ زینت کی اواز زینت سے زیادہ محرك شہوت ہے – زمانہ جاہلیت میں عورت جب راستہ چلتی اور اس کے پاؤں میں پازیب وغیرہ ہوتے تو اپنے پاؤں کو زمین پر مارتی تاکہ مرد اس کی آواز سن لیں – اللّٰہ تعالے نے ایمان والی عورتوں کو ایسی حرکت کرنے سے منع کردیا کہ جس سے ان کے زریوروں کی آواز مردوں تك پہنچے اور مردان کی آواز سن کر ان کی طرف راغب ہوں – گزشتہ آیت میں زینت کے اظہار کی ممانعت تھی، اب اس آیت میں زینت کی آواز کے اظہار کی ممانعت فرمائی کہ جس طرح زینت کا اظہار موجب فتنہ ہے اسی طرح زینت کی آواز کا اظہار بھی موجب فتنہ ہے اور ممنوع ہے اور ظاہر ہے کہ خود عورت کی اواز زیورکی آواز سے زیادہ موجب فتنہ ہے – لہذا عورت کی آواز – زینت کی آواز سے زیادہ حرام ہوگی، جیساکہ سورہ احزاب کی یہ آیت "وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ" اس بارہ میں نص صریح ہے – مقصود یہ ہے کہ عورتوں کو چاہئے کہ چلتے وقت ایسی حرکت نہ کریں جس سے مردوں کو عورتوں کے جانے اور چلنے کا علم ہوجائے اور ان کے پازیب کی اواز مردوں کی شہوت کا برانگیختہ کر نے کا سبب بنے –

---

৫৯. তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্দালভী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

www.amarboi.org

'এ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচার থেকে বাঁচার চারটি[৬০] কৌশল বাতলে দেয়ার পর পঞ্চম কৌশলটির কথা আলোচনা করছেন। পঞ্চম কৌশলটি হচ্ছে ঈমানদার মহিলারা হিজাবের ব্যাপারে এত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করবেন যে, হাঁটাচলার সময় যেন পায়ে ব্যবহৃত অলংকার (যেমন নূপুর)-এর শব্দও পরপুরুষের কানে না যায়।

যুজাজ বলেন, অলংকারের শব্দ অলংকারের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। জাহিলী যুগে মহিলারা যখন রাস্তায় চলতো তখন খুব জোরে জোরে পা ফেলে হাটতো, যেন নূপুরের শব্দ পুরুষরা শুনতে পায়। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম মহিলাদের এরূপ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। যাতে তাদের নূপুরের শব্দ পুরুষের কানে পৌছে পুরুষদের উতলা করতে না পারে। আগে অলংকার ও সৌন্দর্য প্রকাশ নিষেধ করা হয়েছিলো, এবার অলংকারের শব্দ যাতে না হয় সেজন্যও নিষেধ করা হচ্ছে। রূপ সৌন্দর্য ও অলংকার প্রকাশে যেমন বিপর্যয়ের আশংকা করা হয়েছে তেমনিভাবে অলংকারের মিষ্টি আওয়াজেও বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আর এটা স্পষ্ট যে, নারীর কণ্ঠস্বর অলংকারের শব্দের চেয়েও অধিক ফিতনার কারণ হয়। তাই নারীর কণ্ঠস্বর অলংকারের শব্দের চেয়েও অধিক মাত্রায় হারাম।

মহিলাদের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে সূরা আল আহযাবে যা বলা হয়েছে–

وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ -

'তোমরা ললিত কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না, এতে যাদের মনে রোগ আছে তারা প্ররোচিত হয়।'

এ আয়াতটিই হচ্ছে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের নস বা অকাট্য প্রমাণ। মোট কথা মহিলারা বাইরে বের হলে তাদের নূপুরের আওয়াজ বা অলংকারের আওয়াজ যেন পুরুষদের কর্ণগোচর না হয় এবং তাদের কামনাকে উস্কে না দেয়।[৬১]

বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআনুল কারীম প্রিন্টিং কমপ্লেক্স কর্তৃক সংকলিত ও প্রচারিত উর্দূ তাফসীর আল কুরআনুল কারীম-এ বলা হয়েছে–

---

৬০. লেখক যে চারটি কৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হচ্ছে–

ক. পুরুষরা তাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে।

খ. মহিলারা তাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে।

গ. মহিলারা তাদের রূপ সৌন্দর্য দেখিয়ে বেড়াবে না।

ঘ. সর্বদা ওড়না দিয়ে মাথা ও বুক ভালোভাবে ঢেকে রাখবে।

৬১. তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্দালভী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

www.amarboi.org

اس سے مراد وہ زینت اور حصہ جسم ہے جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو۔ جسے کسی کو کوئی چیز پکڑاتے یا اس سے لیتے ہوے ہتھلیوں کا، یا دیکھتے ہوئے انکھوں کا ظاہر ہوجانا۔ اس ضمن میں ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہوئی یا مہندی لگی ہو، انکھوں میں سرمہ، کاجل ہو یا لباس اور زینت کو چھپانے کے لئے جو بر قعہ یا چادر لی چاتی ہے۔ وہ بھی ایک زینت ہی ہے تاہم یہ ساری زینتیں ایسی ہیں جن کا اظہار بوقت ضرورت یا بو جہ ضرورت مباح ہے۔

'এ কথা দিয়ে শরীরের সেই অংশ এবং সৌন্দর্যকে বুঝানো হয়েছে যা লুকিয়ে রাখা কিংবা পর্দা করা সম্ভবপর নয়। যেমন কেউ যদি কিছু ধরতে চান তাহলে হাত ছাড়া ধরা সম্ভব নয়, দেখতে চাইলে চোখ ছাড়া দেখাও সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে চোখ এবং হাত প্রকাশ হয়েই পড়বে। এক্ষেত্রে হাতে যদি আংটি পরা থাকে কিংবা মেহেদী লাগানো থাকে অথবা চোখে সুরমা বা কাজল লাগানো থাকে (তাও প্রকাশ হয়ে পড়ে) অথবা পোশাকের সৌন্দর্য গোপন করতে গিয়ে যে চাদর বা বোরকা পরা হয় তাও এক ধরনের সৌন্দর্য (যীনাত)। তারপরও এসব সৌন্দর্য এমন, যার প্রকাশ অনেক সময় ঘটে যায়। প্রয়োজনে এমনটি ঘটে গেলে তা মুবাহ্ হিসেবে গণ্য হবে।'[৬২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) লিখেছেন–

اس آیت کے مفہوم کو تفسیروں کے مختلف بیانات نے اچھا خاصا مبہم بنا دیا ہے، و نہ بجائے خود بات بالکل صاف ہے – پہلے فقرے میں ارشاد ہوا ہے کہ لاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ، "وہ اپنی آرائش وزیبائش کو ظاہر نہ کریں" اور دوسرے فقرے میں اِلاَّ بول کر اس حکم نہی سے جس چیز کو مستثنی کیا گیا ہے وہ ہے مَا ظَهَرَ مِنْهَا "جو کچہ اس آرائش وزیبائش میں سے ظاہر ہو، یاظاہر ہو جائے" اس سے صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خود

৬২. আল কুরআনুল কারীম (উর্দূ), বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআনুল কারীম প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, সৌদি আরব, পৃ. ৯৭৪, টীকা-২, তাফসীর সূরা আন নূর।

www.amarboi.org

اس کا اظہار اور اس کی نمائش نہ کرنی چاہیے، البتہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے (جیسے چادر کا ہوا سے اڑجانا اور کسی زینت کا کھل جانا) یا جو آپ سے آپ ظاہر ہو (جیسے وہ چادر جو اوپر سے اوڑھی جاتی ہے، کیونکہ بہرحال اس کا چھپانا تو ممکن نہیں ہے ، اور عورت کے جسم پر ہو نے کی وجہ سے بہر حال وہ بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے) اس پر خداکی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے - یہی مطلب اس آیت کا حضرت عبد اللّٰہ بْن مسعود، حسن بصری، ابن سیرین اور ابراہیم نخعی نے بیان کیاہے - اس کے بر عکس بعض مفسرین نے مَا ظَهَرَ مِنْهَا- کا مطلب لیا ہے ما یظهره الانسان علی العادة الجاریة (جسے عادة انسان ظاہر کرتا ہے) اور پھر وہ اس میں مُنہ اور ہاتھوں کو ان کی تمام آرائشوں سمیت شامل کردیتے ہیں - یعنی ان کے نزدیک یہ جائز ہے کہ عورت اپنے مُنہ کو مسّی اور سرمے اور سرخی پاوڈر سے اور اپنے ہاتھوں کو انگوٹھی چھلی اور چوڑیوں اور کنگن وغیرہ سے آراستہ رکھ کر لوگوں کے سامنے کھولے پھرے - یہ مطلب ابن عباس رض اور ان کے شاگردوں سے مروی ہے اور فقہاء حنفیہ کے ایک اچھے خاصے گروہ نے اسے قبول کیا ہے (احکام القرآن جصاص، جلد ۳، صفحہ-۳۸۸-۳۸۹) لیکن ہم یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ مَا ظَهَرَ کے معنی مَا يَظْهَرُ عربی زبان کے کس قاعدے سے ہو سکتے ہیں- "ظاہر ہو نے" اور "ظاہر کرنے" میں کھلا ہوا فرق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن صریح طور پر"ظاہر کرنے" سے روک کر "ظاہر ہونے" کے معاملے میں رخصت دے رہا ہے - اس رخصت کو "ظاہر کرنے" کی حد تک وسیع کرنا قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان روایات کے بھی خلاف جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں حکم حجاب آجانے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں،

www.amarboi.org

اور حکم حجاب میں منہ کا پردہ شامل تھا، اور احرام کے سوا دوسری تمام حالتوں میں نقاب کو عورتوں کے لباس کا ایک جز بنا دیا گیا تھا -

پھر اس سے زیادہ قابل تعجب بات یہ ہے کہ اس رخصت کے حق میں دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ منہ اور ہاتھ عورت کے ستر میں داخل نہیں ہیں - حلانکہ ستر اور حجاب میں زمین وآسمان کا فرق ہے - ستر تو وہ چیز ہے جسے محرم مردوں کے سامنے کھولنا بھی نا جائز ہے - رہا حجاب تو وہ ستر سے زائد ایک چیز ہے جسے عورتوں اور غیر محرم مردوں کےدرمیان حائل کیا گیا ہے - اورہماں بحث ستر کی نہیں بلکہ احکام حجاب کی ہے -

'তাফসীরের কিতাবসমূহের বিভিন্ন বর্ণনা এ আয়াতটির অর্থকে বেশ জটিল করে তুলেছে। নইলে বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। একেবারে পরিষ্কার। প্রথম বাক্যাংশে বলা হয়েছে–

لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ অর্থাৎ 'তারা যেন নিজেদের রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।' আর দ্বিতীয় বাক্যাংশে إِلَّا। শব্দটি বলে এ নিষেধাজ্ঞায় যেসব জিনিসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা থেকে যা কিছু নিষিদ্ধের বাইরে রাখা হয়েছে তা হচ্ছে– مَا ظَهَرَ مِنْهَا অর্থাৎ যা কিছু এ সাজসজ্জা থেকে আপনা আপনি প্রকাশ হয় বা প্রকাশ হয়ে যায়।' এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে মহিলাদের এগুলো প্রকাশ ও এসবের প্রদর্শনী না করা উচিত। তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় (যেমন, চাদর বাতাসে উড়ে যাওয়া এবং কোনো আবরণ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া) অথবা যা নিজে নিজে প্রকাশিত হয় (যেমন, ওপরে যে চাদরটি জড়ানো থাকে, কোনো ক্রমেই তাকে লুকানো সম্ভব নয় আর নারীদের শরীরের সাথে লেপটে থাকার কারণে তার মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে একটি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়) সেজন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোনোরূপ পাকড়াও হবে না। এ আয়াতের এই অর্থই বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা), হাসান বসরী (রহ), ইবনু সীরীন (রহ) ও ইবরাহীম নাখঈ (রহ)। পক্ষান্তরে কোনো কোনো তাফসীরকার مَا ظَهَرَ مِنْهَا এর অর্থ নিয়েছেন–

www.amarboi.org

ما يظهره الانسان على العادة الجارية -

'মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ করে দেয়।'

তারপর তারা এর মধ্যে চেহারা ও হাতকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন, সাজসজ্জা সহ। অর্থাৎ তাদের মতে মহিলারা তাদের গালে রুজ পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক ও চোখে সুরমা লাগিয়ে এবং হাতে আংটি, চুড়ি ও কংকন ইত্যাদি পরে তা উন্মুক্ত রেখে লোকদের সামনে চলাফেরা করবে। ইবনুল আব্বাস (রা)ও তাঁর শিষ্যগণের বর্ণনা এরূপ। হানাফী ফকীহ্‌দের এক বিরাট অংশও এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। (আহকামুল কুরআন, জাসসাস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৮, ৩৮৯) কিন্তু আরবী ভাষার কোন্ নিয়মে مَا ظَهَرَ (যা প্রকাশিত হয়) কে مَا يَظْهَرُ (যা প্রকাশ করে) এর অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে তা আমি বুঝতে অক্ষম। 'প্রকাশ হওয়া' ও 'প্রকাশ করার' মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে এবং আমরা দেখি কুরআন স্পষ্টভাবে 'প্রকাশ করা' থেকে বিরত রেখে 'প্রকাশ হওয়ার' ব্যাপারে অবকাশ দিচ্ছে। এ অবকাশকে 'প্রকাশ করা' পর্যন্ত বিস্তৃত করা কুরআনেরও বিরোধী এবং এমনসব হাদীসেরও বিরোধী যেগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, নবী যুগে হিজাবের নির্দেশ এসে যাবার পর মহিলারা চেহারা খুলে চলতেন না। হিজাবের নির্দেশের মধ্যে চেহারার পর্দাও শামিল ছিলো এবং ইহ্‌রাম ছাড়া অন্যান্য সব অবস্থায় নিকাবকে মহিলাদের পোশাকের একটি অংশে পরিণত করা হয়েছিল। তারপর এর চেয়েও মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ অবকাশের পক্ষে যুক্তি হিসেবে একথা পেশ করা হয় যে, মুখ ও হাত মহিলাদের সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ সতর ও হিজাবের মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য। সতর মুহার্‌রাম পুরুষদের সামনে খোলাও জায়েয নয়। আর হিজাব তো সতরের অতিরিক্ত একটি জিনিস, যাকে নারীদের ও গাইরি মুহার্‌রাম পুরুষদের মাঝখানে আটকে দেয়া হয়েছে এবং এ আয়াতে সতর নয় বরং হিজাব-ই আলোচ্য বিষয়।'[৬৩]

ওপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে বুঝা যায় শুধুমাত্র একজন সাহাবী (হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস)-এর অভিমতকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ইবনুল আব্বাস (রা) ছাড়া আর কোনো সাহাবী এরূপ অভিমত প্রকাশ করেননি। আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা) তো বলিষ্ঠভাবে এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। অবশ্য ইবনুল আব্বাস (রা)-এর অন্য বক্তব্যে ইবনু মাসউদ (রা)-এর মতকেই সমর্থন করা হয়েছে (তাফসীর ইবনু কাছীর দ্রষ্টব্য)। পর্দা সংক্রান্ত সূরা আল

৬৩. তাফহীমুল কুরআন, তৃতীয় জিল্‌দ, সূরা নূরের তাফসীর, টীকা-৩৫।

www.amarboi.org

আহযাব ও সূরা আন নূরের সবগুলো আয়াত একত্রিত করে অধ্যয়ন করলে এবং সাহাবা কিরামের আমলী যিন্দেগীর দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় ইবনু মাসউদ (রা)-এর অভিমতই সঠিক ও বাস্তব সম্মত। তাছাড়া মহিলাদের মুখমণ্ডলের গুরুত্বের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমাদের সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিও একই রায় প্রদান করে। মহিলাদের মুখমণ্ডলের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী বলেছেন–

انَّهُ اَصْلُ الْجَمَالِ وَمَصْدَرُ الْفِتْنَةِ وَمَكْمَنَ الْخَطَرِ ـ

'মুখমণ্ডল হচ্ছে সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং বিপর্যয়ের উৎস এবং বিপদের ঘাঁটি।'[৬৪]

ইমাম কুরতুবী বলেন–

فَانَّهُ اَصْلُ الزِّيْنَةِ وَجَمَالُ الْخِلْقَةِ وَمَعْنَى الْحَيْوَانِيَّةِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمَنَافِعِ

'মুখমণ্ডল হচ্ছে রূপ সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল, সৃষ্টিগত সৌন্দর্য এবং নারী জীবনের মাহাত্ম-মাধুর্য এখানেই।'[৬৫]

আল্লামা মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী তাঁর বিখ্যাত তাফসীর রাওয়ায়িউল বায়ানে লিখেছেন–

فهو ان المرأة لا يجوز النظر أليها خشية الفتنة، والفتنة فى الوجه تكون اعظم من الفتنة بالقدم والشعر والساق.

فاذا كانت حرمة النظر ألى الشعر والساق بالاتفاق فحرمة النظر ألى الوجه تكون من باب أولى باعتبار أنه أصل الجمال ـ ومصدر الفتنة، ومكمن الخطر.

'মহিলাদের দিকে তাকানো জায়েয নয় শুধু ফিতনার আশংকায়। আর চেহারা খোলা থাকলে যে ফিতনা (বিপর্যয়)-এর সৃষ্টি হয় তা পা, নলা এবং চুল খোলা রাখার চেয়েও মারাত্মক।

---

৬৪. রাওয়ায়িউল বায়ান তাফসীর আয়াতুল আহকাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

৬৫. তাফসীর আল জামিউল আহকাম (তাফসীর কুরতুবী), দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ১৫২।

www.amarboi.org

যেখানে পায়ের নলা এবং চুলের দিকে তাকানো সর্বসম্মতক্রমে হারাম সেখানে চেহারার দিকে তাকানো আরো বেশি হারাম হওয়া উচিত। কারণ তা হচ্ছে– সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু, ফিতনা বা বিপর্যয়ের উৎস এবং অনিষ্টের কার্যকারণ।'[৬৬]

তাছাড়া মুখমণ্ডল খোলা রাখা ও ঢেকে রাখা সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে পরস্পর বিরোধী দুটো মত পাওয়া যায়। বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে দুটো মতেরই উল্লেখ রয়েছে। মুখ খোলা রাখা সংক্রান্ত অভিমতটি পাওয়া যায় আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আর মুখ ঢেকে রাখা সংক্রান্ত অভিমতটি পাওয়া যায় 'জিলবাব' এর আয়াতের ব্যাখ্যায়। এ দুটো বিপরীতমুখী বক্তব্যের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, নারীদের মুখ ও হাতকে তিনি সতরের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন না, তাই এ দুটো জিনিসকে তিনি খোলা রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। কেননা সতর তো সারাক্ষণ ঢেকে রাখার জিনিস। আর যখন কোনো মহিলা একান্ত প্রয়োজনে বাইরে যাবে তখন জিলবাব বা বোরকা পরে মুখমণ্ডল ঢেকে বের হবে এটিই ছিলো তাঁর মূল কথা।

এ দুটো মতের সমন্বয় কল্পে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) লিখেছেন–

وَجَوَّزَ لَهَا اِبْدَاءُ زِيْنَتِهَا الظَّاهِرَةِ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَذَوِىْ الْمَحَارِمِ وَكَانُوْا قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ اٰيَةُ الْحِجَابِ ـ كَانَ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ بِلاَ جِلْبَابٍ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا وَيَدَهَا ـ وَكَانُوْا اِذَا ذَاكَ يَجُوْزُ لَهَا اَنْ تُظْهِرَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ـ وَكَانَ حِيْنَئِذٍ يَجُوْزُ النَّظْرُ اِلَيْهَا لاَنَّه يَجُوْزُ لَهَا اِظْهَارَه ـ ثُمَّ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ الْحِجَابِ بِقَوْلِه :

(يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ) حَجَبَ النِّسَاءُ عَنِ الرِّجَالِ ـ

..... فَاِذَا كُنَّ مَامُوْرَاتُ بِالْحِجَابِ كَانَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ مِنَ

৬৬. রাওয়ায়িউল বায়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

www.amarboi.org

الزِّيْنَةِ الَّتِىْ أُمِرَتْ اَلاَّ تُظْهِرَهَا لِلاَجَانِبِ ـ فَمَا بَقِىَ يَحِلُّ لِلاَجَانِبِ النَّظَرَ اِلاَّ اِلٰى ثِيَابِ الظَّاهِرَةِ فَابْنُ مَسْعُوْدٍ ذَكَرَ اٰخِرَ الْاَمْرَيْنِ وَابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ اَوَّلَ الْاَمْرَيْنِ ـ

'প্রথমে পুরুষদের সামনে মহিলাদের প্রকাশ্য সৌন্দর্য প্রকাশ করা বৈধ ছিলো। আর তা ছিলো 'জিলবাব'-এর আয়াত নাযিলের আগের কথা। তখন আরব-মহিলারা 'জিলবাব' ছাড়া বাইরে বের হতো। তখন যেহেতু মেয়েদের চেহারা ও হাত খোলা থাকতো, তাই তাদের চেহারা ও হাতের দিকে তাকানো জায়েয ছিলো। এরপর যখন আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা পর্দার আয়াত নাযিল করেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط

হে নবী! আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন (বাইরে বের হলে) তাদের 'জিলবাব'-এর প্রান্ত তাদের ওপর ভালোভাবে টেনে দেয়।

তখন থেকে মেয়েরা পুরুষদের থেকে তাদের আড়াল করে রাখে। ..... যখন মেয়েদেরকে 'জিলবাব' এর নির্দেশ দেয়া হয় তখন চেহারা ও হাত 'যীনাত' (সৌন্দর্য)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যা গাইরি মুহার্‌রাম (পরপুরুষ)-এর সামনে খোলা রাখতে বারণ করা হয়েছে। এরপর গাইরি মুহার্‌রাম পুরুষের জন্য মেয়েদের প্রকাশ্য আচ্ছাদন ছাড়া আর কিছুই দেখা বৈধ থাকে না। তাই বলা যায়, আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা) পর্দা-বিধানের শেষ কথাটিই বলেছেন আর আবদুল্লাহ্ ইবনুল আব্বাস (রা) বলেছেন পর্দা-বিধান কার্যকর হবার আগের কথা।'[৬৭]

আল্লামা শানকিতী (রহ) লিখেছেন–

قوله تعالى : (وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) من أن استقراء القران يدل على أن معنى الا ماظهر منها الملاءة فوق الثياب وأنه لا يصح تفسير إلا ماظهر منها بالوجه والكفين كما تقدم إيضاحه.

৬৭. মাজমুউন ফাতওয়া, একাদশ খণ্ড, পৃ. ১১০-১১১।

www.amarboi.org

'আল কুরআনের এ বক্তব্যটি গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অধ্যয়ন করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا (স্বতঃই যা প্রকাশিত হয়) বলতে পরিধেয় কাপড়ের বাহ্যিক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা اِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا দ্বারা চেহারা, হাত ইত্যাদিকে বুঝিয়েছে বলে তাফসীর করেছেন (যা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে) তা সঠিক নয়।'[৬৮]

চতুর্থ কারণ : কতিপয় হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা

কতিপয় হাদীসের ভুল ব্যাখ্যাও এজন্য কম দায়ী নয়। হাদীসের স্থান, কাল ও প্রেক্ষাপটের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বক্তব্যের সমর্থনে সেগুলো পেশ করে নিজ যুক্তি বহাল রাখার প্রচেষ্টাও করেছেন অনেকে। সাধারণ লোক তো এতকিছু খতিয়ে দেখার যোগ্যতা রাখেন না। তাঁরা দেখেন এ বক্তব্যের সমর্থনে হাদীস আছে, ব্যস তাদের আপত্তির আর কোনো কারণ থাকে না। চেহারা খোলা রাখার সপক্ষে যেসব হাদীস তাঁরা দলিল হিসেবে দাঁড় করাতে চান, এবার আমরা সেইসব হাদীস পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করে তার পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো, ইনশা আল্লাহ্। প্রথমেই তাঁরা যে হাদীসটি দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন সেটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শালী আসমা (রা)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। হাদীসটি হচ্ছে–

এক.

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَاَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلاَّ هٰذَا وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ -

'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার আবু বাকরের কন্যা আসমা পাতলা ফিনফিনে কাপড় পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য

৬৮. আদাউল বায়ান– আল্লামা শানকিতী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৬, ৫৮৭।

www.amarboi.org

দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আসমা! মেয়েরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন এমন কাপড় পরা উচিত নয় যাতে তাদের শরীর দেখা যায়। তবে এইটুকু এইটুকু ছাড়া, একথা বলার সময় তিনি মুখমণ্ডল ও দুহাতের তালুর দিকে ইশারা করলেন।"[৬৯]

পর্যালোচনা

এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ বলেছেন–

هٰذَا مُرْسَلٌ خَالِدِ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ -

এই হাদীসটি মুরসাল। কারণ– বর্ণনাকারী খালিদ ইবনু দুরাইক আয়িশা (রা)-এর সাক্ষাৎ পাননি।

হাদীসটির দ্বিতীয় দুর্বলতা হচ্ছে বর্ণনাকারীদের মধ্যে সাঈদ ইবনু বশীর নামে এমন একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যাকে ইবনু মাহদী মাত্রুক বা পরিত্যাজ্য বলেছেন।

তাছাড়া ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, ইমাম নাসাঈ, ইয়াহ্ইয়া ইবনু মাঈন, ইবনু আল্ মাদীনী প্রমুখ তাকে দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেজন্য মুহাদ্দিসগণ একে দুর্বল (জঈফ) হাদীস গণ্য করেছেন। দুর্বল ও মুরসাল হাদীস শরঈ কোনো নির্দেশের ভিত্তি হতে পারে না।

তাছাড়া পর্দার বিধান নাযিল হয়েছে ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ হিজরী সনে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় হিজরাত করার চার কিংবা পাঁচ বছর পর হিজাব এর নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু আসমা (রা) সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে একত্রিত করে অধ্যয়ন করলে মনে হয় এ হাদীসটি হিজাব এর নির্দেশ দেয়ার আগের। মোটকথা বর্ণনাকারীদের ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার পরও এরূপ একটি হাদীসকে ইসলামী শরীআহ্র গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধানের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা সমীচীন নয়।

দুই.

মুখমণ্ডল হিজাব-এর বাইরে একথা প্রমাণ করার জন্য আরেকটি হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করা হয়। হাদীসটি হচ্ছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَائَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ

৬৯. সুনানু আবী দাউদ, হাদীস-৪০৫৯ (ই.ফা)।

www.amarboi.org

تَسْتَفْتِيْهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الْاٰخَرِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

'আবদুল্লাহ্ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। ফযল ইবনুল আব্বাস (রা) সওয়ারীতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় খাছআম গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে মাসয়ালা জানতে এলো। ফযল তার দিকে এবং মহিলাটিও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ ফযলের মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মহিলা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ওপর যে হজ্জ ফরয করেছেন তা আমার বৃদ্ধ পিতার ওপরও ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের ওপর অবস্থান করতে অক্ষম! আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বললেন– হাঁ, পারো। এ ঘটনা বিদায় হজ্জের সময়ের।'[৭০]

পর্যালোচনা

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও ইমাম বুখারী রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ আল বুখারীর রিওয়ায়াতে কিছু শব্দ বেশি রয়েছে। যেমন ফযল (রা)-এর শারীরিক সৌন্দয সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি ছিলেন সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী।' তাঁর চুলগুলোও ছিলো কালো কুচকুচে। 'মহিলা সুন্দরী ছিলেন' সে কথাও বলা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছিলো বিদায় হজ্জ চলাকালীন সময়ে। বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো হিজরী দশম সনে। আর পর্দার বিধান নাযিল হয়েছিলো পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ সনে। তাই একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এ হাদীস পর্দার বিধান জারির পরের ঘটনা। তবে মুখ খোলা রাখার পক্ষে যারা এ হাদীসটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন তারা অবশ্য একটি কথা চেপে যান। সেটি হচ্ছে, মহিলাদের হজ্জ পালনের সময় ইহ্রাম বাঁধলে মুখ খোলা রাখা বাধ্যতামূলক। যেমন– সুনান আবূ দাউদ এর এক হাদীসে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

৭০. সহীহ্ মুসলিম, হাদীস-৩১১৭ (ই.ফা)।

www.amarboi.org

لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبِسُ الْقُفَازَيْنِ

'ইহ্‌রাম বাঁধা মহিলারা যেন চেহারায় নিকাব না লাগায় এবং হাতমোজা পরিধান না করে।'[৭১]

বজলুল মাজহুদ গ্রন্থে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আরেকটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন–

اِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِىْ وَجْهِهَا -

'মেয়েদের ইহ্‌রাম তাদের মুখমণ্ডলে।'[৭২]

হানাফী মাযহাবের ফিক্‌হের কিতাব হিদায়ায় বলা হয়েছে–

اِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تُغَطِّىْ وَجْهَهَا مَعَ اَنَّ فِىْ الْكَشْفِ فِتْنَةٌ -

'বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকলেও মহিলারা ইহ্‌রাম অবস্থায় মুখমণ্ডল ঢাকবে না।'[৭৩]

তাই হজ্জের সময় ইহ্‌রাম বাঁধা একজন মহিলা মুখ খোলা রেখে আল্লাহ্‌র রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে গিয়ে মাস্‌য়ালা জিজ্ঞেস করতেই পারেন। তবে এ ঘটনা অন্য সময়ের জন্য দলিল হতে পারে না। যাঁরা এ হাদীসকে মুখ খোলা রাখার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন তাঁরা ঠিক করেন না।

তিন.

মুখ খোলা রাখার পক্ষে নিচের হাদীসটিও প্রমাণ হিসেবে আনা হয়।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ -

'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন

৭১. সুনান আবূ দাউদ, হাদীস-১৮২৬ (ই.ফা)।
৭২. বজলুল মাজহুদ, দশম খণ্ড, পৃ. ৪৯।
৭৩. হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯।

www.amarboi.org

ফজরের সালাত শেষ করতেন তখন মহিলারা সারা শরীর চাদর দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেতো না।'[৭৪]

পর্যালোচনা

কোনো কোনো বর্ণনাকারী- مُتَلَفِّعَات শব্দের পরিবর্তে مُتَلَفِّفَات শব্দটি ব্যবহার করেছেন। উভয় শব্দের অর্থ একই অর্থাৎ চাদর গায়ে দেয়া। تلفف শব্দটি لفافة শব্দ থেকে উদ্ভূত আর تلفع শব্দ لفاع শব্দ থেকে উদ্ভূত। উভয় শব্দের অর্থ চাদর। হানাফীদের মতে, مِنَ الْغَلَسِ শব্দটি আয়িশা (রা)-এর নয় বরং তার উক্তি مَا يَعْرِفْنَ শব্দেই শেষ হয়ে গেছে। তার উদ্দেশ্য ছিলো মহিলারা চাদর গায়ে দিয়ে আসতো সেজন্য তাদের চেনা যেত না। কোনো রাবী (বর্ণনাকারী) মনে করেছেন এই চেনা না যাবার কারণ অন্ধকার। তাই مِنَ الْغَلَسِ। শব্দটি বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ শব্দটি যে মূল হাদীসের নয় তার প্রমাণ ইবনু মাজায় ফজর নামাযের ওয়াক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত এই হাদীসটি-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّيْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ اِلٰى اَهْلِهِنَّ فَلاَ يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ تَعْنِيْ مِنَ الْغَلَسِ۔

'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ঈমানদার মহিলারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ফজর নামায পড়তাম। শেষে মহিলারা তাদের পরিজনদের দিকে ফিরে যেতেন। তাদেরকে কেউ চিনতে পারতেন না।

এখানে تَعْنِيْ শব্দটি পরিস্কার বলছে পরের অংশটি অর্থাৎ مِنَ الْغَلَسِ শব্দটি বর্ণনাকারী কর্তৃক সংযোজিত। শরহে মাআনিল আছার-এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেখানেও مِنَ الْغَلَسِ শব্দটি নেই। আর যদি অসম্ভবকে মেনে নিয়ে শুধু না চেনার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয় তাহলে এর উত্তর হলো, এই না চেনার কারণ ছিলো চাদর, অন্ধকার নয়।'[৭৫]

---

৭৪. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৮২৫,৮৩০ (ই.ফা), মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-২৪১৫১। মুয়াত্তা মালিক। সহীহ্ মুসলিম। সুনানু আবী দাউদ।

৭৫. দরসে তিরমিযি- মুফতী তকী উসমানী, অনুবাদ- নোমান আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০৩-৬০৫।

www.amarboi.org

চার.

عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اخَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ ـ فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى اُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِلَةً ـ فَقَالَ لَهَا مَا شَانُكِ قَالَتْ اَخُوْكَ اَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهٗ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا ـ فَجَاءَ اَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهٗ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَانِّىْ صَائِمٌ ـ قَالَ مَا اَنَا بِاٰكِلٍ حَتّٰى تَاْكُلَ ـ فَاَكَلَ ـ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ اَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ نَمْ فَنَامَ ـ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ نَمْ ـ فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الانَ قَالَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهٗ سَلْمَانُ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهٗ ـ فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانَ ـ

'আওন ইবনু আবু জুহাফা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। সালমান ও আবুদ্ দারদার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। একদিন সালমান আবুদ্ দারদার সাথে দেখা করতে গেলেন। সেখানে উম্মুদ্ দারদাকে বিমর্ষ ও সাধারণ পোশাকে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কী হয়েছে? বললেন, আপনার ভাই আবুদ্ দারদার দুনিয়াতে কিছুর প্রয়োজন নেই। ইতোমধ্যে আবুদ্ দারদা এলেন। তার জন্য খাবার প্রস্তুত করে বললেন, আপনি খেয়ে নিন, আমি রোযা রেখেছি। সালমান বললেন, যতক্ষণ আপনি না খাচ্ছেন ততক্ষণ আমিও খাচ্ছি না। তখন তিনিও খেলেন। যখন রাত হলো আবুদ দারদা নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, ঘুমিয়ে নিন। তিনি শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার ওঠে দাঁড়ালেন, তিনি বললেন (আরও) ঘুমিয়ে নিন। অবশেষে রাত যখন শেষ হয়ে এলো তখন সালমান বললেন, এখন উঠুন। তারপর তারা উভয়ে নামায পড়লেন। অতপর সালমান বললেন, আপনার ওপর আপনার প্রতিপালকের অধিকার রয়েছে, আপনার নিজের অধিকার রয়েছে এবং

www.amarboi.org

আপনার স্ত্রীর অধিকারও রয়েছে। কাজেই আপনি সবার অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকবেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এ ঘটনা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, সালমান ঠিকই বলেছে।'[৭৬]

পর্যালোচনা

এ হাদীসটি দিয়েও মুখমণ্ডল খোলা রাখার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করা হয় এবং বলা হয় হিজাব শুধু নবীপত্নীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। সাধারণ মহিলারা হিজাব ব্যবহার করতেন না।

অথচ একটু মনযোগ দিলেই বুঝতে পারা যায় এ হাদীসটি হিজাবের বিধান নাযিল হওয়ার আগের ঘটনা। সহীহ হাদীস, সীরাত ও ঐতিহাসিক গ্রন্থরাজি থেকে প্রমাণিত হয় হিজরাতের পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনসারদের সাথে যেসব মুহাজিরদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন, সেই মুহাজিরগণ কয়েক বছরের মধ্যেই স্বাবলম্বী হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে আনসার ভাইদের কাছে তাদের আর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়নি। মাঝে মাঝে তারা সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হতেন। এ হাদীসের ঘটনাটিও একটি সৌজন্য সাক্ষাতের ঘটনা। তবে তা অবশ্যই পর্দা বা হিজাবের আয়াত নাযিলের আগের। তাই ঢালাওভাবে এ হাদীসটিকে সবাই হিজাবের বিপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে চাননি।

পাঁচ.

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ اِلَى السُّوْقِ فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَاَةٌ شَابَّةٌ ـ فَقَالَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلَكَ زَوْجِيْ وَتَرَكَ صَبِيَّةً صِغَارًا وَاللّٰهِ مَا يُنْضِجُوْنَ كُرَاعًا وَلاَ لَهُمْ زَرْعٌ وَلاَ ضَرْعٌ وَخَشِيْتُ اَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ وَاَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ اَيْمَانَ الْغِفَارِيِّ وَقَدْ شَهِدَ اَبِى الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيْبٍ ـ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى بَعِيْرٍ ظَهِيْرٍ كَانَ مَرْبُوْطًا فِى الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلأَهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ

৭৬. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৫৭০৯ (ই.ফা)।

www.amarboi.org

بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ - ثُمَّ قَالَ اقْتَادِيْهِ فَلَنْ يَفْنِىَ حَتّٰى يَأْتِيَكُمُ اللّٰهُ بِخَيْرٍ -

আসলাম (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে বাজারে গেলাম। সেখানে এক যুবতী মহিলা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার স্বামী ছোট সন্তান রেখে মারা গেছেন। আল্লাহ্‌র কসম! তাদের আহারের জন্য বকরীর একটি খুরাও নেই। নেই কোনো ফসলের ব্যবস্থা, দুধেল উটনী কিংবা ছাগল। পোকা তাদেরকে খেয়ে ফেলবে বলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে। আমি খুফাফ বিন আইমান আল গিফারীর কন্যা। তিনি হুদাইবিয়ার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একথা শুনে উমার (রা) তাকে অতিক্রম না করে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমার গোত্রকে ধন্যবাদ। তারা তো আমার খুব কাছের লোক। এরপর তিনি বাড়িতে এসে আস্তাবলে বাঁধা উট থেকে একটি মোটা তাজা উট এনে দুই বস্তা খাদ্যসশ্য এবং এর মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও বস্ত্র রেখে সেগুলো উটের পিঠে উঠিয়ে মহিলার হাতে তার লাগাম দিয়ে বললেন, তুমি এটি টেনে নিয়ে যাও। এগুলো শেষ হওয়ার আগেই আল্লাহ্ হয়তো তোমাদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন।'[৭৭]

পর্যালোচনা

যারা মুখ খোলা রাখার পক্ষে বলেন, তাঁরা এ হাদীসটিকেও প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ–

ক. যুবতী ও বৃদ্ধা নির্ণয় করার জন্য মুখ খোলা রাখতে হবে এটি খুবই দুর্বল যুক্তি। মুখ ঢাকা থাকলেও হাত ও পা দেখে এবং কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে খুব কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, মহিলা যুবতী না বৃদ্ধ।

খ. হাদীসে যুবতী বলা হয়েছে শুধু এ কথার ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি না যে, সেই মহিলার চেহারা খোলা ছিলো। বরং এটিই দৃঢ়তার সাথে বলা যায়, হযরত উমার (রা) ইসলামের ব্যাপারে যে কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন সেই উমার (রা)-এর সামনে একজন মহিলা খোলা মুখে দাঁড়াবেন এ কথা বোধ হয় সেই মহিলাও কল্পনা করতে পারেননি। তাছাড়া মহিলার মুখ খোলা ছিলো এমন কথা তো হাদীসটিতে বলা হয়নি।

৭৭. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৩৮৫২ (ই.ফা)।

www.amarboi.org

ছয়.

عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلٰى بِلَالٍ فَاَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَحَثَّ عَلٰى طَاعَتِهِ وَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضٰى حَتّٰى اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَاِنَّ اَكْثَرَ كُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ خَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ ـ

'জাবির ইবনু আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি খুতবার আগে নামায আদায় করলেন, আযান ইকামাত ছাড়া। অতঃপর তিনি বিলালের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহকে ভয় করে চলার (তাকওয়া অর্জনের) নির্দেশ দিলেন। তাঁর আনুগত্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। তিনি সমবেত জনতাকে উপদেশ দিয়ে বুঝালেন। তারপর মহিলাদের কাছে গিয়ে তাদেরকেও উপদেশ দিলেন। বললেন, তোমরা দান সাদাকা কর। কেননা তোমাদের বেশির ভাগ মহিলাই জাহান্নামের জ্বালানী হবে। (একথা শুনে) মহিলাদের মধ্য থেকে দুই গালে কালো দাগ পড়া এক মহিলা দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো। হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কেন জাহান্নামের জ্বালানী হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন– তোমরা বেশি বেশি বাহানা তালাশ করো এবং স্বামীর অবাধ্য হও।'[৭৮]

পর্যালোচনা

যারা মহিলাদের চেহারা খোলা রাখা জায়েয মনে করেন তারা এ হাদীসটিও দলিল হিসেবে পেশ করেন। কিন্তু হাদীসটি সহীহ্ হলেও কয়েকটি কারণে মুখ খোলা রাখা জায়েয প্রমাণিত হয় না।

ক. মহিলাদের গালে বার্ধক্যের কারণেই সাধারণত কালো দাগ পড়ে থাকে। যাকে

৭৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯২৫ (বি.আই.সি.); ঈদের নামায অধ্যায়।

www.amarboi.org

অনেকে মেছ্তা বলে থাকেন। যুবতী মহিলাদের এরূপ হয় না বললেই চলে। যেহেতু মহিলা বৃদ্ধা ছিলেন তাই মুখ খোলা রাখা তাঁর জন্য মুবাহ্ ছিলো।

খ. অথবা এমনও হতে পারে, বর্ণনাকারী হিজাবের বিধান নাযিল হওয়ার আগে মহিলাকে দেখেছিলেন কিংবা মহিলা তাঁর পরিচিত। যেজন্য তিনি মহিলার ব্যাখ্যামূলক পরিচয় দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

গ. তাছাড়া ঈদের নামায ওয়াজিব হয়েছে হিজরী দ্বিতীয় সনে আর হিজাবের বিধান এসেছে হিজরী ৫ম ও ৬ষ্ঠ সনে। হিজাবের বিধান নাযিলের আগের কোনো এক ঈদেও এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

ঘ. তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় হিজাবের বিধান নাযিলের পর এ ঘটনা ঘটেছে। তবু তা একজন মহিলার ব্যক্তিগত আমল। আল কুরআন ও অনেকগুলো সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় একজন মহিলার ব্যক্তিগত আমল শরী'আতের দলিল হতে পারে না।

সাত.

عَنْ سَهْلٍ اَنَّ امْرَأَةً عَرِضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْءٌ قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلَكِنْ هٰذَا اِزَارِيْ وَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ سَهْلٌ وَمَالَهُ رِدَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَصْنَعُ بِاِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى اِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَاٰهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ اَوْ دُعِيَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْلَكْنَاكَهَا بِمَامَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

www.amarboi.org

'সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মহিলা এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিজকে পেশ করলেন। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার কাছে কী আছে? সে উত্তর দিল, আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যাও, তালাশ কর, কোন কিছু পাও কিনা? যদি লোহার একটি আংটিও পাও (তা নিয়ে এসো)। লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, কিছুই পেলাম না, এমনকি লোহার একটি আংটিও না; কিন্তু আমার এ তহবন্দখানা আছে। এর অর্ধেকাংশ তার জন্য। সাহল (রা) বলেন, তার নিজের দেহে কোন চাদরও ছিল না। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার তহবন্দ দিয়ে কী করবে? যদি তুমি এটা পর, মহিলার শরীরে কিছুই থাকবে না, আর যদি সে এটা পরে তবে তোমার শরীরে কিছুই থাকবে না। এরপর লোকটি অনেকক্ষণ বসে রইলো। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে চলে যেতে দেখে ডাকলেন (বা তাকে ডাকানো হলো) এবং বললেন, তুমি কুরআন কতটুকু জান? সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং সে সূরাগুলোর উল্লেখ করলো। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার বিনিময়ে তোমাকে এর সাথে বিয়ে দিলাম।'[৭৯]

পর্যালোচনা

যারা মনে করেন মুখ ঢেকে রাখা হিজাবের অংশ নয় তারা এ হাদীসটিকেও প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। অথচ এ হাদীসের বিষয়বস্তু আমাদের স্পষ্ট বলে দেয় উক্ত মহিলা এসেছিলেন নিজের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। আর বিয়ের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে পাত্র-পাত্রী উভয় উভয়কে দেখে নেবে। এটি সুন্নাত। আর বিয়ের যে পাত্রী থাকবেন, বরের দেখা এবং পছন্দ করার সুবিধার্থে মুখ খোলা রাখবেন। পাত্রীর মুখ খোলা রাখা ইসলামে জায়েয আছে। আমরা ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনাও করেছি। ইমাম আবু বাকর আল জাসসাস এর মতে–

فَاذَا كَانَ يَشْتَهِيْهَا اِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا جَازَ اَنْ يَّنْظُرَ لِعُذْرٍ مِثْلُ اَنْ يُّرِيْدُ تَزَوُّجَهَا ـ

৭৯. সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম।

www.amarboi.org

'যদি ওযরবশত দেখতে বাধ্য হয় এবং দেখার ইচ্ছে থাকে তবু দেখা জায়েয। যেমন বিয়ের জন্য পাত্রী দেখা।'[৮০]

কাজেই দেখা যায় যেহেতু সেই মহিলা নিজেকে বিয়ের পাত্রী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন সেহেতু তিনি মুখ খোলা রেখেছেন। যাতে পাত্র তাকে ভালোভাবে দেখে নিতে পারেন। সাধারণ মহিলারা মুখ খোলা রাখতে পারবেন এ হাদীস দিয়ে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় না।

তাছাড়া এ ঘটনাটি পর্দার বিধান কার্যকর হওয়ার পরের না পূর্বের তা নির্দিষ্ট করে হাদীসে কোন ইঙ্গিত করা হয়নি। পর্দার বিধান নাযিলের আগের ঘটনাও হতে পারে এবং সেই সম্ভাবনাই বেশি। কারণ হিজরাতের ৪/৫ বছর পর মুসলিমদের দারিদ্রাবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল।

আট.

عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلَى اِمْرَأَةٍ مِنْ اَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَأَهَا لاَ تَكَلَّمُ فَقَالَ مَا لَهَا لاَ تَتَكَلَّمُ قَالُوْا حَجَّتْ مُصْمِتَةً قَالَ لَهَا تَكَلَّمِىْ فَاِنَّ هٰذَا لاَ يَحِلُّ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ مَنْ اَنْتَ؟ قَالَ اِمْرَأٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتْ اَىُّ الْمُهَاجِرِيْنَ؟ قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَتْ مِنْ اَىِّ قُرَيْشٍ اَنْتَ؟ قَالَ اِنَّكَ لَسَؤُلٌ، اَنَا اَبُوْ بَكْرٍ، قَالَتْ مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هٰذَا الاَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِيْ جَاءَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ اَئِمَّتُكُمْ، قَالَتْ وَمَا الاَئِمَّةُ؟ قَالَ اَمَا كَانَ لِقَوْمِكَ رُؤُسٌ وَاَشْرَافٌ يَأْمُرُوْنَهُمْ فَيُطِيْعُوْنَهُمْ قَالَتْ بَلَى، قَالَ فَهُمْ اُولَئِكَ عَلَى النَّاسِ ـ

'কায়িস ইবনু আবু হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন আবু বাকর (রা) আহমাস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলেন। তার নাম ছিলো যায়নাব। দেখলেন সে কথাবার্তা বলছে না। তিনি জানতে চাইলেন, সে কেন কথাবার্তা বলছে না।

৮০. আহকামুল কুরআন, ৩/৩১৫।

www.amarboi.org

লোকজন উত্তর দিলেন, সে বোবা হজ্জের (অর্থাৎ কথাবার্তা না বলে হজ্জ পালনের) নিয়াত করেছে। আবু বাকর (রা) তাকে বললেন, এটা ঠিক নয়। এতো জাহিলী যুগের কাজ। কথাবার্তা বলো। তখন মহিলাটি কথাবার্তা বলতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলো– 'আপনি কে?' 'আমি একজন মুহাজির' বললেন আবু বাকর (রা)। সে আবার প্রশ্ন করলো– 'আপনি কোন গোত্রের মুহাজির?' তিনি উত্তর দিলেন– 'কুরাইশ গোত্রের।' 'কুরাইশের কোন শাখার আপনি?' আবার প্রশ্ন করলো। 'তুমি তো বেশ প্রশ্ন করতে পারো!' –আবু বাকর (রা) বললেন, 'আমি আবু বাকর'। 'জাহিলিয়াতের পর উত্তম ও কল্যাণকর যে দীন বা জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ্ দিয়েছেন সেই দীনের ওপর আমরা কতদিন সঠিকভাবে চলতে পারবো?' মহিলা প্রশ্ন করলো। আবু বাকর (রা) উত্তর দিলেন 'যতদিন তোমাদের নেতৃবৃন্দ তোমাদেরকে নিয়ে দীনের ওপর অবিচল থাকবেন'। 'নেতৃবৃন্দ কারা?'– সে আবার প্রশ্ন করলো। আবু বাকর (রা) বললেন– 'তোমাদের গোত্রে বা সমাজে সম্ভ্রান্ত কেউ নেই যার কথা সকলে মেনে চলে?' মহিলা বললো–'হাঁ'। 'এরাই হচ্ছেন জনগণের নেতা'– বললেন আবু বাকর (রা)।'[৮১]

পর্যালোচনা

আবু বাকর (রা) মহিলার মুখ খোলা ছিল বিধায় তার কথাবার্তা না বলার বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। যারা মুখমণ্ডল খোলা রাখার পক্ষে হাদীসের দলিল পেশ করেন তারা এ হাদীসটিকেও প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করে থাকেন। কয়েকটি কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ক. এই হাদীসটি সহীহ্ আল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে– কায়িস ইবনু আবু হাযিম (রা) থেকে। কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে স্বয়ং সেই মহিলা যায়নাব বিনতু মুহাজির (রা) থেকে। মহিলা হজ্জ করছিলেন একথা সহীহ্ আল বুখারীর বর্ণনায় পরোক্ষভাবে এসেছে। কিন্তু কানযুল উম্মালের বর্ণনায় আরও সুস্পষ্টভাবে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে–

'যায়নাব বিনতু মুহাজির বলেন, হজ্জে যাচ্ছিলাম। আমার সাথে আরও একজন মহিলা ছিলেন। তাঁবু লাগানোর পর আমি মানত করেছিলাম, কারও সাথে কোনো কথা বলবো না। এক ব্যক্তি আমাদের তাঁবুর কাছে এসে 'আস সালামু আলাইকুম' বললেন। আমি কোনো উত্তর দিলাম না। আমার সফরসঙ্গী তাঁর সালামের জবাব দিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার সাথীর কী হয়েছে তিনি তো সালামের

৮১. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৩৫৫৭ (ই.ফা)।

www.amarboi.org

জবাব দিলেন না'। বলা হলো– 'তিনি মানত করেছেন (হজ্জ শেষ না করে) কারও সাথে কোনো কথা বলবেন না।' এ কথা শুনে তিনি বললেন,– ' এ ধরনের মানত ছেড়ে দিন, কথাবার্তা বলুন, এ ধরনের মানত করা তো জাহিলী যুগের কাজ।'[৮২] এরপর অবশিষ্ট হাদীস সহীহ্ আল বুখারীর অনুরূপ।

বুখারীর বর্ণনার চেয়ে কানযুল উম্মালের বর্ণনা আরও পরিষ্কার। হযরত আবু বাকর (রা) তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন। মুখ খোলা ছিলো একথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। আমরা ধরে নিতে পারি যদি মহিলা ইহ্রাম বেঁধে রওয়ানা হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর মুখ খোলা ছিলো। আর যদি মীকাতে গিয়ে ইহ্রাম বাঁধার নিয়াত করে থাকেন তাহলে মুখ অবশ্যই ঢাকা ছিলো। তবে উভয় হাদীসের বক্তব্য থেকে পরোক্ষভাবে বুঝা যায় তিনি হজ্জের নিয়াতে ইহ্রাম বেঁধেই রওয়ানা হয়েছিলেন। নইলে ইহ্রাম বাঁধার আগে কথা বলতে সমস্যা ছিলো না। আর ইহ্রাম অবস্থায় মহিলাদের মুখ খোলা রাখা অন্য সময়ে মুখ খোলা রাখার পক্ষে দলিল হতে পারে না।

খ. এ হাদীসটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে পর্দার বিধান বা হিজাবের প্রমাণ হিসেবে নয়। এটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে জাহিলী যুগের রসম রেওয়াজের মূলোৎপাটন এবং নেতৃত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

নয়.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَطُوْفُ خَلْفَهَا يَبْكِىْ وَدُمُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلٰى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبَّاسٍ يَا عَبَّاسُ اَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيْرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيْرَةَ مُغِيْثًا، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاجَعْتِهِ، قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَأْمُرُنِىْ، قَالَ اِنَّمَا اَنَا اَشْفَعُ قَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِىْ فِيْهِ ـ

'ইবনুল 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরার স্বামী ক্রীতদাস ছিল। মুগীছ বলে তাকে ডাকা হতো। আমি যেন এখনও তাকে দেখছি সে বারীরার পেছনে কেঁদে কেঁদে ঘুরছে, আর তার দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৮২. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৫৩। ফিক্হে আবু বাকর (রা)-ড.রাওয়াস কালাজী পৃ. ৪৯।

www.amarboi.org

ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে 'আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীছের ভালবাসা এবং মুগীছের প্রতি বারীরার অনাসক্তি দেখে তুমি কি আশ্চর্যান্বিত হওনা? এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (বারীরা) তুমি যদি তার কাছে আবার ফিরে যেতে! সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি সুপারিশ করছি মাত্র। সে বলল, আমার তার কোন প্রয়োজন নেই।'[৮৩]

পর্যালোচনা

স্বামী তার বিবাহ্ বিচ্ছেদকারী স্ত্রীর পেছনে ছুটছেন এবং কাঁদছেন এ ঘটনা একজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, ব্যস অমনি দাবী করা হলো বর্ণনাকারী যদি সেই মহিলার মুখ খোলা অবস্থায় না দেখে থাকেন তাহলে তাকে চিনলেন কি করে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় তাদের এ দাবী খুবই হাস্যকর।

ক. মদীনার তৎকালীন মুসলিম সমাজের পরিধি খুব বেশি বিস্তৃত ছিলো না। মদীনার মাসজিদে আছর নামায পড়ে কেউ হেঁটে লোকালয়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে আবার হেঁটে এসে মদীনার মাসজিদে মাগরিব নামায পড়তেন, এই মর্মে হাদীসও রয়েছে। তাছাড়া যারা বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা বেশিরভাগ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহচর্যেই কাটাতেন। ফলে রাসূল পরিবারের সাথে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের সকলকেই তাঁরা চিনতেন। বারীরাহ্ এবং তাঁর স্বামী মুগীছ (রা) উভয়ই যথাক্রমে ক্রীতদাসী ও ক্রীতদাস ছিলেন। বারীরাহ্ (রা) কে হযরত আয়িশা (রা) মুক্ত করে দেন।[৮৪] ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী মুক্ত হওয়ার পর তাদের বিয়ে বহাল রাখা না রাখা তাদের ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। সেই অনুসারে বারীরাহ তার স্বামী থেকে বিয়ে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন। ক্রীতদাসী থাকাবস্থায় তো বারীরাহ্ (রা) হিজাব ব্যবহার করেননি তাই হাদীস বর্ণনাকারীরা অনেকেই সেসময় তাঁকে দেখেছিলেন। যার কারণে পরে তাঁকে চিনতে অসুবিধা হয়নি।

খ. তাছাড়া বারীরাহ্ (রা)-এর স্বামী মুগীছ (রা) একজন মহিলার পিছু পিছু হাঁটছেন এবং কাঁদছেন কিন্তু মহিলা তাকে পাত্তা দিচ্ছেন না সেই মহিলা কে হতে পারেন তা কি মুখ দেখে বলার প্রয়োজন আছে?

গ. বারীরাহ্ দাসত্ব মুক্তির পর স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন।

---

৮৩. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৪৯০৩ (ই.ফা)।

৮৪. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৪৯০৪ (ই.ফা)।

www.amarboi.org

তখনকার সেই ছোট্ট মুসলিম সমাজে এ কথাগুলো সবার কানেই প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলো। তাই মুগীছ (রা) কার পেছনে হাঁটছিলেন সেকথা মুখ দেখে বলার প্রয়োজন ছিলো না।

ঘ. তাছাড়া বারীরাহ্ (রা)-এর যে ব্যক্তিত্ব ও তাকওয়ার কথা হাদীসে এসেছে তাতে তিনি স্বাধীন হওয়ার পর ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান হিজাব মানবেন না সে কথা কল্পনাও করা যায় না।

পঞ্চম কারণ : পাশ্চাত্যের সাথে আপোষকামী মনোভাব

আধুনিক শিক্ষিত একটি মহল পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে ইসলামকে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা অনুযায়ী ঢেলে সাজানোর ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছেন। সেই সাথে কতিপয় আলিমও পাশ্চাত্যের সাথে আপোষকামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের ধারণা ইসলামকে তাদের চিন্তাধারার সাথে খাপ খাওয়াতে পারলে তারা আর মুসলিমদের বিরোধিতা করবে না এবং মুসলিমদের গালমন্দও করবে না। কিন্তু ইতিহাস বড়ই নির্মম। আজ যারা পৃথিবীতে নির্যাতিত হচ্ছে তা শুধু তাদের ধর্মীয় পরিচয় মুসলিম হবার কারণে। যদিও তাদের আচরণ, চাল চলন ইহুদী খৃস্টানদের আচার আচরণ, চালচলন থেকে ভিন্নতর নয়। সেখানে ইসলামের সাথে আপোষ করিয়ে তারা কতটুকু কৃতকার্য হতে চান তা তারাই ভালো বলতে পারবেন। অথচ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন–

قَدْتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَاانْفِصَامَ لَهَا ط

'প্রকৃত, শুদ্ধ ও নির্ভুলকে ভুল চিন্তাধারা থেকে ছেঁটে পৃথক করা হয়েছে। এখন যে 'তাগুত' কে অস্বীকার করে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন একটি মজবুত হাতল ধরলো যা কখনও ছিন্ন হবার মত নয়।'[৮৫]

ষষ্ঠ কারণ : সূরা আন নূর ও সূরা আল আহযাবের পর্দার আয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ব্যর্থতা

বিভিন্ন তাফসীর একই সাথে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় অনেক তাফসীরকার সূরা আন নূর এর ৩০ ও ৩১ নম্বর আয়াত ও সূরা আল আহযাব এর ৫৩ ও ৫৯ নম্বর আয়াতের মধ্যে সমন্বয় করতে পারেননি। তারই প্রভাব পাশ্চাত্যের সাথে যাঁরা

৮৫. সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৫৬।

www.amarboi.org

আপোষকামী তাঁদের ওপরও পড়েছে। তাঁরা মনে করেন সূরা আল আহযাবে হিজাব সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য যদি মুখ ঢেকে রাখা হয় তাহলে সূরা আন নূরে দৃষ্টি অবনত রাখার কথা বলা হয়েছে কেন। দৃষ্টি অবনত করার কথা বলে প্রকারান্তরে বুঝানো হয়েছে মহিলারা মুখ খোলা রাখবে, কিন্তু তোমরা সেদিকে তাকাবে না, দৃষ্টি অবনত রাখবে। অথচ তারা একবারও ভেবে দেখেন না যে, মুসলিম মহিলারা মুখ ঢেকে রাখলেও অমুসলিম মহিলারা খোলামেলা চলাফেরা করে থাকে। কারণ অমুসলিম মহিলারা তো আর হিজাব এর ধার ধারে না। এক্ষেত্রে মুসলিম পুরুষকেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য। তাছাড়া নিকাব ব্যবহারের পরও মহিলাদের চোখ খোলা থাকে, তাই দৃষ্টি অবনত রাখতে উভয়কেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ চোখে চোখেও ভাবের আদান প্রদান করা যায়।

তাফসীরকারগণ যদি সবাই এভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে সমন্বয়ের চেষ্টা করতেন তাহলে ভুল বুঝাবুঝির আশংকা অনেকটা কমে যেত।

হিজাব এর বিপরীত জিনিসের নাম 'তাবাররুজ'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى ـ

'তোমরা তোমাদের ঘরেই অবস্থান কর। পূর্বের জাহেলী যুগের মতো রূপ-সৌন্দর্য দেখিয়ে বেড়িও না।'[৮৬]

তাবিঈ মুবরাদ (রহ) 'তাবাররুজ' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন–

اَنْ تُبْدِىَ مِنْ مَا حَاسِنِهَا مَا يُجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُ ـ

'মহিলাদের যে রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে রাখা কর্তব্য তা প্রকাশ করার নামই 'তাবাররুজ'।[৮৭]

তাবিঈ লাইস (রহ) বলেছেন–

يُقَالُ تَبَرُّجَتِ الْمَرْأَةُ اِذَا اَبْدَتْ مَحَاسِنَهَا مِنْ وَجْهِهَا وَجَسَدِهَا وَيُرِىَ مَعَ ذٰلِكَ مِنْ عَيْنِهَا حُسْنَ نَظَرٍ ـ

৮৬. সূরা আল আহযাব, আয়াত- ৩১।

৮৭. তাফসীর রুহুল মাআনী। সূরা আল আহযাব এর ৩১নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

'কোনো মহিলা যখন তার মুখ ও দেহের সৌন্দর্য প্রকাশ করে আর সেই সাথে তার ডাগর চোখের সৌন্দর্যভরা চাহনিও প্রকাশ পায়, তখন বলা হয় মহিলাটি 'তাবাররুজ' করেছে।'[৮৮]

মুজাহিদ (রহ) 'তাবাররুজ' এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন–

كانت المرأة تخرج تمشى بين يدى الرجال فذلك تبرج الجاهلية ـ

'মহিলারা পুরুষের সামনে বের হতো এবং চলাফেরা করতো। একেই তাবাররুজাল জাহিলিয়্যাহ বলা হয়েছে।'

কাতাদাহ (রহ) বলেছেন–

اذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج ـ

'গর্ব ও মনোরম অঙ্গভঙ্গি সহকারে হেলেদুলে ও সাড়ম্বরে চলার নাম 'তাবাররুজ'।

মুকাতিল ইবনু হাইয়ান (রহ) বলেছেন–

والتبرج انها تلقى الخمار على رأسها ولا تشده، فيوارى قلائدوها وقرطها وعنقها ويبدوا ذلك كله منها وذلك التبرج.

'তাবাররুজ বলা হয় মাথা থেকে ওড়না ফেলে দেয়ার ফলে নিজের হার, গলা ও ঘাড় উন্মুক্ত হয়ে যাওয়াকে।'[৮৯]

আল্লামা জামাল উদ্দিন আল কাসেমী (রহ) লিখেছেন-

التبرج التبخر والتكسر فى المشئى وباظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل وبلبس دقيق الثياب التى لا توارى جسدها وبابداء محاسن الجيد والقلائد والقرط وكل ذلك مما يشلمه النهى لما فيه من المفسدة والتعرض الكبيرة ـ

'তাবাররুজ হচ্ছে– হাস্যলাস্য ও আলুথালু বেশে পথ চলা, রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনী

৮৮. শরঈ পর্দা, মাওলানা আশেক এলাহী।

৮৯. মুজাহিদ, কাতাদা ও মুকাতিলের বক্তব্য দেখুন, তাফসীর কুরআনিল আযীম (ইবনু কাছীর)। ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩১। প্রকাশ কাল- ১৯৮১, বৈরূত।

www.amarboi.org

করা, পুরুষের মনে যৌন সুড়সুড়ি দেয়া, খুব পাতলা ফিনফিনে কাপড় পরা যেন মেয়েদের শরীর, গলা, হার ও কানের দুলের চাকচিক্য বেরিয়ে পড়ে এবং এ ধরনের যে কোনো কাজ। আয়াতে এসব কিছুই নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এর পরিণতি হচ্ছে বিপর্যয় ও বড়ো গুনাহর দিকে পদক্ষেপ।'[৯০]

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) বলেন–

'আরবী ভাষায় 'তাবাররুজ' অর্থ উন্মুক্ত হওয়া, প্রকাশ হওয়া এবং সুস্পষ্ট হয়ে সামনে এসে যাওয়া। দূর থেকে দেখা যায় এমন উঁচু ভবনকে আরবরা 'বুরুজ' বলে থাকে। দুর্গ বা প্রাসাদের বাইরের অংশের উচ্চ-কক্ষকে এজন্যই বুরুজ বলা হয়। পালের নৌকার পাল দূর থেকে দেখা যায় বলে তাকে 'বারজা' বলা হয়। নারীর জন্য এ 'তাবাররুজ' শব্দটি ব্যবহার করা হলে তার তিনটি অর্থ হবে। এক. সে তার চেহারা ও দেহের সৌন্দর্য লোকদের দেখায়। দুই. সে তার পোশাক ও গয়না লোকদের সামনে উন্মুক্ত রাখে। তিন. সে তার চালচলন ও ঠাট-ঠমকের মাধ্যমে নিজেকে অন্যের কাছে তুলে ধরে। অভিধান ও তাফসীর বিশারদগণ শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন।'[৯১]

'হিজাব' যাদের জন্য শিথিল করা হয়েছে

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

'আর যেসব বৃদ্ধা বিয়ের আশা রাখে না, তারা যদি রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছাড়া নিজেদের চাদর নামিয়ে রাখে, তাতে কোনো দোষ নেই। তবে তারা যদি লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে সেটিই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।' [৯২]

এ আয়াতে সেসব মহিলার কথা বলা হয়েছে যারা বিগত যৌবনা-বৃদ্ধা। যারা যৌন-তাড়না অনুভব করেন না। এমনকি তাদেরকে দেখে পুরুষদের মধ্যেও যৌন

৯০. মাহাসিন আত্ তাভীল, খণ্ড-১৩, পৃ. ৪৮,৪৯।

৯১. তাফহীমুল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬,৪৭। আধুনিক প্রকাশনী। সেপ্টেম্বর ২০০০ ঈসায়ী।

৯২. সূরা আন নূর। আয়াত-৬০।

www.amarboi.org

বাসনা জাগ্রত হয় না। তারা যদি 'হিজাব' ব্যবহার না করেন তাতে দোষের কিছু নেই। আয়াতে বলা হয়েছে اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ (যদি তারা তাদের কাপড় খুলে ফেলে), এ কথার অর্থ এই নয় যে, তারা পরনের কাপড় খুলে সতর উন্মুক্ত করে ফেলবে। সকল মুফাসসির ও ফকীহ সর্বসম্মতভাবে এর অর্থ নিয়েছেন এমন চাদর যার সাহায্যে রূপ-সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা 'হিজাব' নামে পরিচিত।

তারপরও দুটো কথা বলা হয়েছে।

এক. যদি কোনো বৃদ্ধা যৌন অক্ষমতার পরও নিজের রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন অব্যাহত রাখেন তার জন্য এ শিথিলতার সুযোগ গ্রহণযোগ্য নয়।

দুই. কোনো বৃদ্ধা যদি শিথিলতার এ সুযোগ গ্রহণ না করে 'হিজাব' মেনে চলেন, সেটি অতি উত্তম ও প্রশংসনীয়।

যেসব প্রয়োজনে সাময়িকভাবে মুখ খোলা যায়

সামাজিকভাবে চলতে গেলে মাঝে মধ্যে এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন মহিলাদের মুখ খোলার প্রয়োজন হয়ে যায়। সেসব অবস্থায় মুখ খোলা যাবে বলে ফকীহগণ অভিমত দিয়েছেন। যেমন–

১. কোনো মহিলা যদি এমন কোনো মামলায় জড়িয়ে পড়েন যেখানে বিচারক সেই মামলার ন্যায্য বিচারের জন্য মহিলাকে সনাক্ত করার প্রয়োজন মনে করেন এবং বিচারক তার মুখ দেখে তাকে সনাক্ত করতে চান এক্ষেত্রে বিচারকের সামনে মুখ খোলা জায়েয আছে।

২. মুআমালাত (সামাজিক লেনদেন) এর প্রয়োজনে মুখ খোলা বৈধ। যেমন কোনো মহিলা যদি বেচা-কেনা, ইজারা বা ভাড়া কিংবা ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট হন এবং তাকে সনাক্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এক্ষেত্রে তিনি মুখ খুলতে পারেন।

৩. নাক, কান ও গলার কোনো জটিলতায় যদি একজন মহিলা ভোগেন এবং তিনি চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন আর চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মুখ খুলতে বলেন তাহলে তিনি মুখ খুলতে পারেন।

৪. বিয়ে করার জন্য যদি কনে দেখা হয় তাহলে মুখ খোলা রেখেই কনে হবু বরের সামনে যেতে পারবে। এ সম্পর্কে সকল মাযহাবের ফকীহগণ একমত।

www.amarboi.org

সহীহ্ মুসলিম, জামে আত্ তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু ইবনু মাজাহ্, মুসনাদে আহমাদসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও এর সপক্ষে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৯৩]

উপরে উল্লেখিত প্রয়োজন ও গুরুত্বের মত যদি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দেয় যখন মুখ খোলা জরুরী হয়ে পড়ে তখন সাময়িকভাবে মুখ খোলা জায়েয আছে।

হিজাব এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু বিষয়

হিজাব পালনের সাথে সাথে আরও কিছু বিষয়ও মেনে চলতে হবে। তাহলেই হিজাব এর সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

এক. জিলবাব কিংবা চাদর বা বোরকার কাপড় এমন পাতলা হবে না যার মধ্য দিয়ে ভেতরের কাপড় ও শরীর দেখা যায়। আসমা বিনতু আবু বাকর (রা) সংক্রান্ত হাদীসে যে আপত্তির কথা বলা হয়েছে তা মূলত: পাতলা ফিনফিনে হওয়ার কারণে।

দুই. হিজাব বা বোরকার কাপড়ই যেন আকৃষ্ট করার মত সুন্দর না হয়। যদি হয় তাহলে وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ (তারা যেন তাদের রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে) এ নির্দেশ পালন করা হবে না এবং তাকে হিজাবও বলা যাবে না। কারণ হিজাব হচ্ছে সৌন্দর্যের আড়ালকারী, সৌন্দর্য প্রকাশকারী নয়।[৯৪]

তিন. হিজাব বা বোরকা হতে হবে ঢিলেঢালা, আটসাঁট নয়। শরীরের উঁচু নিচু জায়গাগুলোর অবস্থান বুঝা যায় এমন হলে হবে না। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

---

৯৩. আল মুফাচ্ছাল আহকামিল মারআতি ওয়া বাইতিল মুসলিম, ড. আবদুল কারীম যায়দান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১১-২১৫।

৯৪. এ সম্পর্কে আল্লামা মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী লিখেছেন–

ألا يكون زينة فى نفسه، أو مبهرجا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار لقوله تعالى : (وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. النور-٣١) الآية ومعنى "ما ظهر منها" أى بدون قصد ولا تعمد، فإذا كان فى ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه، ولا يسمى "حجابا" لأن الحجاب هو الذى يمنع ظهور الزينة للأجانب.

- তাফসীর আয়াতুল আহকাম, ২য় খণ্ড, পৃ-২৭৬।

www.amarboi.org

صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ وَالْمَائِلَةِ لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا ـ

'দু'ধরনের জাহান্নামী লোক রয়েছে যাদের আমি (এখনও) দেখিনি। একদল লোক. যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে। তা দিয়ে লোকদের পেটাবে। আরেক দল মহিলা, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে। যারা অন্যদের আকর্ষণকারী ও আকৃষ্টা, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার ঘ্রাণও পাবে না। অথচ এত এত দূর থেকেও তার ঘ্রাণ পাওয়া যায়।'[৯৫]

চার. সুগন্ধি বা পারফিউম ব্যবহার করে মহিলারা বাইরে বের হবেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

اِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْاَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلاً شَدِيْدًا ـ

'যখন পারফিউম ব্যবহার করে কোনো মহিলা পুরুষদের মাঝে যায় যেন তারা তার ঘ্রাণ অনুভব করে তবে সে এরূপ এরূপ অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে তিনি শক্ত মন্তব্য করেন।'[৯৬]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَتْهُ اِمْرَاَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيْحَ الطِّيْبِ وَلِذَيْلِهَا اِعْصَارٌ فَقَالَ يَا اَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَتْ نَعَمْ ـ قَالَ وَتَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ ـ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ حِبِّىْ اَبَا الْقَاسِمِ يَقُوْلُ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ اِمْرَاَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهٰذَا الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ ـ

---

৯৫. সহীহ্ মুসলিম, হাদীস ৫৩৯৭ (ই.ফা)।

৯৬. সুনানু আবী দাউদ, হাদীস-৪১২৫ (ই.ফা)।

www.amarboi.org

'আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, একবার আমার সাথে এমন এক মহিলার দেখা হয়, যার শরীর থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছিলো এবং তার পাতলা কাপড় বাতাসে উড়ছিলো। আমি তাকে বললাম, হে বেহায়া মহিলা! তুমি কি মাসজিদ থেকে আসছো? সে উত্তরে বললো, হাঁ। তখন বললাম, আমি আমার প্রিয় আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি– যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে এ মাসজিদে আসে তার সালাত কবুল হয় না, যতক্ষণ সে বাড়িতে ফিরে গিয়ে অপবিত্রতার গোসলের মত গোসল না করে।'[৯৭]

পাঁচ. পুরুষদের ভীড় এড়িয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে চলতে হবে।

একবার নামায শেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখতে পেলেন রাস্তায় মহিলা পুরুষ একই সাথে পথ চলছে। তখন মহিলাদের বললেন–

اِسْتَأْخِرْنَ فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْفِقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيْقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ حَتّٰى اِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لِصُوْقِهَا بِهِ ـ

'তোমরা অপেক্ষা কর। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলা তোমাদের উচিত নয় বরং তোমরা এক পাশ দিয়ে যাবে। এরপর মহিলারা দেয়াল ঘেঁষে চলাচল করার ফলে অধিকাংশ সময় তাদের কাপড় দেয়ালের সাথে আটকে যেত।'[৯৮]

ছয়. যদি সফর দীর্ঘ হয় তাহলে একজন মুহরিম পুরুষকে সাথে নিয়ে বেরুতে হবে। যদি নিজস্ব প্রাইভেট গাড়িতে নিজস্ব ড্রাইভার নিয়ে সফরে যেতে হয় তবু সাথে মুহরিম পুরুষ থাকতে হবে। শুধু ড্রাইভারের সাথে সফর করা মহিলাদের জন্য জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ اِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُوْ حُرْمَةٍ مِنْهَا ـ

'কোনো মুসলিম মহিলার জন্য কোনো মুহরিম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া এক রাতের দূরত্ব সমান সফর করাও বৈধ নয়।'[৯৯] অন্য হাদীসে বলা হয়েছে 'যদি সেই দূরত্ব এক বারীদ (অর্থাৎ ১২ মাইল) পরিমাণও হয়।'[১০০]

---

৯৭. সুনানু আবী দাউদ, হাদীস-৪১২৬ (ই.ফা)।

৯৮. সুনানু আবী দাউদ, হাদীস-৫১৮২ (ই.ফা)।

৯৯. সুনানু আবী দাউদ, হাদীস-১৭২৩ (ই.ফা)।

১০০. সুনানু আবী দাউদ, হাদীস-১৭২৫ (ই.ফা)।

www.amarboi.org

সাত. কোমল ও আবেদনময়ী কণ্ঠস্বর পরিহার করা।

যদি কোনো পুরুষ মহিলার মধ্যে কথাবার্তার প্রয়োজন হয় তখন হিজাব ও দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে আরেকটি বিষয়ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তা হচ্ছে– মহিলাদের কণ্ঠস্বর। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ـ

'তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ্ভীরু (মুত্তাকী) হয়ে থাক, তাহলে কখনও কোমল (আবেদনময়ী) স্বরে কথা বলবে না। (এভাবে কথা বললে) যারা রোগাক্রান্ত মনের লোক তারা লোভী ও লালসা কাতর হয়ে পড়বে। বরং স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত কথা-ই বলবে।'[১০১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী বলেছেন–

لا قلن القول عند مخاطبة الناس كما تفعله المريباب من النساء فانه يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة ـ

'লোকদের সাথে কথা বলার সময় সুরেলা ও মিষ্টি কণ্ঠে বলো না, যেমন সন্দেহজনক মেয়েরা করে থাকে। কারণ এরূপ কথা অনেক সময় বিরাট নৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।'[১০২]

তাফসীর মাযহারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخضع الرجل لغير امرأة اى يلين لها بالقول بما يطمعها منه ـ

'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন, পুরুষরা যেন তাদের স্ত্রী ছাড়া অন্য মহিলার সাথে কোমল ও কামনা জড়িত কণ্ঠে কথা না বলে। সেই কথা শুনে যেন কোনো মহিলার মনে লালসার উদ্রেক হতে না পারে।[১০৩]

---

১০১. সূরা আল আহযাব, আয়াত-৩২।

১০২. ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৮।

১০৩. তাফসীর মাযহারী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭।

www.amarboi.org

আট. লুকানো সাজ-সৌন্দর্য বা অলংকারের শব্দ প্রকাশ না করা।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ -

'তারা যেন তাদের লুকানো সাজ-সৌন্দর্য লোকদের সামনে প্রকাশ করার জন্য সজোরে পা না ফেলে।'[১০৪]

নয়. স্বামী-স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি অন্যের কাছে প্রকাশ না করা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِىْ اِلٰى امْرَاَةِ وَتَفْضِىْ اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا -

'কিয়ামাতের দিন সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম বলে গণ্য হবে যে স্ত্রীর সান্নিধ্যে এবং স্ত্রী স্বামীর সান্নিধ্যে আসে তারপর গোপন বিষয়াদি অন্যের কাছে বলে বেড়ায়।'[১০৫]

দশ. মালিকানাধীন ব্যক্তি ও সন্তানের জন্য তিনটি সময় অনুমতি না নিয়ে ঘরে প্রবেশ করা জায়েয নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ - مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ - ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ - طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ -

'ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাধীন ব্যক্তি এবং এমন সন্তান যারা এখনও

১০৪. সূরা আন নূর, আয়াত-৩১।

১০৫. সহীহ মুসলিম।

www.amarboi.org

বুদ্ধির সীমানায় পৌঁছেনি, তাদের অবশ্যই তিনটি সময় অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসা উচিত। ফজর নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা পোশাক ছেড়ে রেখে দাও এবং ইশার নামাযের পরে। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয় সময়। অন্য সময়ে তারা বিনা অনুমতিতে তোমাদের কাছে এলে তাদের ও তোমাদের কোনো দোষ নেই। (কারণ) তোমাদের পরস্পরের কাছে বার বার আসতেই হয়।'[১০৬]

এগার. সন্তান বড়ো হয়ে গেলে সব সময় অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে হবে।

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

'আর তোমাদের সন্তানেরা যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তাদের তেমনি অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসা উচিত, যেমন তাদের বড়োরা অনুমতি নিয়ে থাকে।'[১০৭]

বার. স্বামীর কাছে অন্য কোনো মহিলার রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা না দেয়া।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

لاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا -

'এক মহিলা আরেক মহিলার সাথে দেখা সাক্ষাতের পর স্বামীর কাছে গিয়ে তার (রূপ-সৌন্দর্যের) বর্ণনা এমনভাবে করবে না, যেন সে (স্বামী) তাকে দেখতে পাচ্ছে।'[১০৮]

তের. মহিলাদের যাবতীয় সাজসজ্জা কেবল স্বামীর জন্যই করতে হবে।

স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দেখানোর জন্য সাজসজ্জা করা উচিত নয়। বাইরে বেরুনোর সময় সাজসজ্জা করে বের হওয়া তো একথাই প্রমাণ করে, যাদের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছে এ সাজসজ্জা মূলত: তাদেরকে দেখানোর জন্য করা হয়েছে। হাঁ, যদি এমন কোনো প্রোগ্রাম হয় যেখানে পর্দানশীন মহিলা ছাড়া আর কোনো লোকের উপস্থিতি বা দেখার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সাজগোজে কোনো দোষ নেই। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

---

১০৬. সূরা আন নূর, আয়াত-৫৮।

১০৭. সূরা আন নূর, আয়াত-৫৯।

১০৮. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৪৮৬৫ (ই.ফা)। সহীহ্ মুসলিম।

www.amarboi.org

وَ نِسَآءٌ كَاسِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَاَسْنِمَةَ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْهَا ـ

'যেসব মহিলা কাপড় পরেও প্রায় উলঙ্গ থাকবে এবং পর পুরুষকে আকৃষ্ট করবে আর নিজেরাও আকৃষ্টা হবে, মাথাগুলো (অর্থাৎ তাদের খোপাগুলো) হবে বড়ো বড়ো উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। এরা তো জান্নাতে যাবেই না; তার সুগন্ধও এরা পাবে না।[১০৯]

নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুগে 'হিজাব'

হিজাব বা পর্দার বিধান নাযিলের পর তৎকালীন মুসলিম সমাজের প্রত্যেক সদস্য মনে করতেন হিজাব একটি অলংঘনীয় বিধান। স্বাধীন মহিলা ও বাঁদীর মধ্যে পার্থক্যকারী নিদর্শন। তাছাড়া উম্মাহাতুল মুমিনীন (নবীপত্নীগণ) প্রত্যেক সাহাবীর কাছে অপরিসীম শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে সামান্য খারাপ ধারণাও তাঁরা পোষণ করতেন না। তবু তাঁদের সাথে পর্দা করার এমন কঠোর বিধান জারী করা হয়েছে, যেন সহজেই উম্মাতকে হিজাব এর অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা যায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে হিজাব এর গুরুত্ব সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

স্বাধীন নারী ও বাঁদীর পার্থক্যকারী নিদর্শন হচ্ছে 'হিজাব' ঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খাদেম আনাস (রা) বলেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাইবার ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে তিনদিন অবস্থান করলেন এবং হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়ার সাথে রাত যাপন করলেন। আমি মুসলিমদেরকে ওয়ালিমার (বিয়ে-ভোজ-এর) দাওয়াত দিলাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দস্তরখান বিছানোর নির্দেশ দিলেন, যেখানে রুটি-গোশত ছিলো না। খেজুর, পনির, মাখন ও ঘি রাখা হলো। এটিই ছিলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়ালিমা। উপস্থিত মুসলিমগণ আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর

১০৯. সহীহ্ মুসলিম।

www.amarboi.org

স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করবেন নাকি বাঁদীর? তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফিয়ার জন্য হিজাব এর ব্যবস্থা করেন তাহলে ধরে নেব তিনি নবীপত্নীর মর্যাদা পেলেন। যখন সেখান থেকে যাত্রা শুরু হলো তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উটের পেছনে সাফিয়াকে বসালেন এবং তাঁর ও লোকদের মাঝখানে হিজাব এর ব্যবস্থা করলেন।[১১০]

উম্মুল মুমিনীনগণ সর্বদা হিজাব পালন করতেন ঃ

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল (রা)সহ মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তখন আমিও সেখানে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললো, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পূরণ করবেন না? তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে বললো, সুসংবাদ গ্রহণের কথা তো আপনি আমাকে অনেক বারই বলেছেন। তিনি আবু মূসা ও বিলালের দিকে ফিরে রাগত স্বরে বললেন, লোকটি সুসংবাদ ফিরিয়ে দিচ্ছে। তোমরা দুজন তা গ্রহণ কর। উভয়ে বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি একপাত্র পানি চাইলেন। (পানি আনা হলো) তিনি সেই পাত্রে উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুয়ে কুলি করলেন, তারপর (আবু মূসা ও বিলালকে) বললেন, তোমরা উভয়ে এ পাত্র থেকে পান কর এবং নিজের মুখমণ্ডল ও বুকে ছিটিয়ে দাও আর সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা উভয়ে সেই পাত্র নিয়ে নির্দেশ অনুযায়ী করতে লাগলেন। এমন সময় উম্মু সালামা (রা) পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্যও কিছু রেখে দিয়ো।[১১১]

আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোথাও সফরে বের হতেন তখন তিনি তার স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করতেন। যার নাম ওঠতো তাকে নিয়ে বের হতেন। কোনো এক যুদ্ধে আমার নাম ওঠলো। আমি তাঁর সাথে বের হলাম। এটি পর্দার আয়াত নাযিলের পরের ঘটনা। আমাকে হাওদায় করে ওঠানো হতো এবং নামানো হতো। এভাবেই আমরা চললাম। যুদ্ধ শেষে ফেরার সময় মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে যাত্রা বিরতি করা হলো। রাত

১১০. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৪৭১৮ (ই.ফা)।

১১১. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৩৯৯২ (ই.ফা)।

www.amarboi.org

থাকতেই পুনরায় রওয়ানা দেয়া হবে এই ঘোষণাও দেয়া হলো। .....আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে যখন সওয়ারীর কাছে এলাম, দেখতে পেলাম আমার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে আমার একটু দেরী হয়ে গেল। আমি হাওদার ভেতর আছি মনে করে লোকেরা তা উটের পিঠে ওঠিয়ে রেখে দিলো। .....সেনাদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হার পেয়ে গেলাম এবং যেখানে তারা ছিলো সেখানে ফিরে এলাম। .....আমি সেখানেই আমার জায়গায় বসে পড়লাম। আমার চোখে ঘুম নেমে এলো। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান ইবনু মুআত্তাল সুলামী যাকওয়ানী সেনাদলের পেছনে পেছনে আসছিলেন। (সেনাদলের কারোর কোনো জিনিস রয়ে গেলে তিনি সেটি ওঠিয়ে নিতেন, এটাই ছিলো তখনকার নিয়ম।) তিনি শেষ রাতে রওয়ানা দিয়ে ভোরবেলা আমার জায়গায় এসে পৌছলেন। তিনি দূর থেকে একটি মানুষের কাঠামো শুয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি আমার কাছাকাছি এলে আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। হিজাব এর বিধান নাযিলের আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে ওঠলেন। তার আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং আমি জেগে ওঠলাম।

فَخَمَّرْتُ وَجْهِيْ بِجِلْبَابِيْ

তখন আমি আমার চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে নিলাম।.....[১১২]

নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত দুধ পান সম্পর্কিত আত্মীয়ের সাথেও হিজাব পালন করেছেন ঃ

আয়িশা (রা) বলেছেন, আফলাহ্ আমার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি না দেয়ায় তিনি বললেন, আমি তোমার চাচা, আর তুমি আমার সাথে পর্দা করছো? বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী আমার ভাইয়ের দুধ (অর্থাৎ ভাইয়ের কারণে তার স্তনে হওয়া দুধ) তোমাকে পান করিয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– আফলাহ্ ঠিকই বলেছে, তাকে সাক্ষাতের অনুমতি দাও।[১১৩]

---

১১২. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৪৩৯৫ (ই.ফা)।

১১৩. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-২৪৬৮ (ই.ফা)।

www.amarboi.org

হিজড়াদের থেকেও তাঁরা হিজাব পালন করতেন ঃ

আয়িশা (রা) বলেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীদের কাছে এক হিজড়া আসতো। তাদেরকে নারী-সঙ্গের প্রয়োজনহীনদের মধ্যে গণ্য করা হতো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন সে (হিজড়া) তার কোনো স্ত্রীর কাছে এক নারীর (দেহ সৌষ্ঠবের) বিবরণ দিচ্ছিলো। বলছিলো– যখন সামনে এগিয়ে আসে, তখন চার ভাঁজ নিয়ে এগিয়ে আসে আর যখন ফিরে যায় আট ভাঁজ নিয়ে ফিরে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এতো দেখছি এখানকার সব বিষয়ই বুঝে। সে যেন তোমাদের কাছে আর না আসে। এরপর তারা তার থেকে হিজাব করতেন।[১১৪]

হজ্জের ইহ্‌রাম পরার পরও তাঁরা নিকাবের গুরুত্ব দিতেন ঃ

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا حَاذُوْا بِنَا سَدَلَتْ اِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا فَاِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ ـ

'অনেক কাফিলা (হজ্জের মওসুমে) আমাদের অতিক্রম করছিলো আর আমরা ইহ্‌রাম পরা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তারা আমাদের সামনে এসে পড়লে আমাদের (কাফিলার) মহিলারা মাথার কাপড় টেনে মুখ ঢাকতেন। তারা আমাদের থেকে দূরে চলে গেলে আমরা আমাদের মুখমণ্ডল খুলতাম।'[১১৫]

সাহাবা কিরামের যুগে হিজাব

নবী যুগের মতো সাহাবা কিরামের যুগেও হিজাবের গুরুত্ব কম ছিলোনা। তাই অবকাশ থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধারা হিজাব পরিত্যাগ করেননি –

عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَالِ قَالَ كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتُ سِيْرِيْنَ

১১৪. সহীহ্ মুসলিম, হাদীস-৫৫০৩ (ই.ফা)।

১১৫. সুনানু আবী দাউদ, হাদীস-১৮৩৩ (ই.ফা)।

www.amarboi.org

وَقَدْ جَعَلَتِ الْجَلْبَابَ هٰكَذَا وَتَنَقَّبَتْ بِهٖ فَنَقُوْلُ لَهَا رَحِمَكِ اللّٰهُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ ـ قَالَ فَتَقول لنا اى شئى بعد ذلك فنقول وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ فنقول هو اثبات الجلباب ـ

আসেম আল আহওয়াল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাফসা বিনতু সীরীন এর কাছে গেলাম। তিনি আমাদের দেখামাত্র চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। তখন আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। আল্লাহ বলেছেন, 'বৃদ্ধা নারী যাদের বিয়ের আশা নেই তাদের জন্য এটা অপরাধ নয় যে, তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখবে।' হাফসা আমাদেরকে বললেন, এরপর কী? আমরা বললাম, (আল্লাহ্র বাণী) 'তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। হাফসা বললেন, একথা দ্বারা চাদর ব্যবহারের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।[১১৬]

একান্ত প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে যাবার ব্যাপারটি উমার (রা) যদিও নিষেধ করতেন না, তবে পুরুষদের সাথে কোনো মহিলা মেলামেশা করবে এটি তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, 'তোমরা মহিলাদের কম পোশাক পরিচ্ছদ দাও, কারণ পোশাক ও অলংকার বেশি হলেই তারা বাইরে বেরিয়ে সেগুলো প্রদর্শন করতে চাবে। তাছাড়া নারী পুরুষ মিলে কোনো ইবাদাতে অংশগ্রহণ করাটাও তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি সুলাইমান ইবনু আবু হাতিমাহ্ (রা)কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, রমযান মাসে মহিলাদের নিয়ে মাসজিদের এক কোণে তারাবীহ্ নামায পড়ার জন্য। যদি ফরয নামাযে একাধিক ইমাম কাছাকাছি নামায পড়ালে মাকরূহ্ না হতো তাহলে তিনি ফরয নামাযের জন্যও পৃথক ইমাম নিযুক্ত করে দিতেন। শৌচাগারে (হাম্মাম বা পাবলিক টয়লেট)-এ গোসলের সময়ও অমুসলিম মহিলা থেকে মুসলিম মহিলাদের পর্দা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুসলিম মেয়েরা বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর হিজাব এর পূর্ণ অনুসরণ করতে গিয়ে সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে বিধায় তাদের বিয়ে শাদীর

১১৬. হিজাবুল মারআতিল মুসলিমা, নাসিরুদ্দীন আলবানী, পৃ. ৫২। তিনি বলেছেন- বাইহাকী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সনদ এর দিক থেকে হাদীসটি সহীহ্।

www.amarboi.org

ব্যাপারে যাতে পাত্রপক্ষ এগিয়ে আসতে পারে সেজন্য তিনি দুটো নির্দেশ দিয়েছিলেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদেরকে যেন বেশি বেশি আত্মীয়-স্বজনের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। এর কারণ তিনি নিজেই বলেছেন– 'হয়তো সে কোনো চাচার (ছেলের) কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে যেতে পারে।" উমার (রা)-এর শাসনামলে এক মহিলা স্বামীর অনুমতি নিয়ে সাজসজ্জা করে বাইরে বেরোয়। উমার (রা) এ কথা জানতে পেরে তাকে ডেকে পাঠান। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। তখন তিনি বক্তৃতা দিয়ে বললেন, যে মহিলা বাইরে গেছে এবং যে তাকে বাইরে যেতে অনুমতি দিয়েছে উভয়কে পেলে টুকরো টুকরো করবো। যে মহিলা তার ভাই কিংবা বাপকে দেখতে যাবে তার এতো সাজগোজের কী প্রয়োজন? পুরনো কাপড় পরে গেলেও তো পারে। ফিরে এসে স্বামীর জন্য সাজগোজ করবে।'[১১৭]

ইবনু মাসউদ (রা)-এর অভিমত হচ্ছে– মহিলারা বাইরে যেতে হলে তাদের পোশাকের ওপর বড়ো লম্বা চাদর ঝুলিয়ে দেবে। যেন তাদের সারা শরীর ঢেকে যায়। সেই লম্বা চাদরটি অবশ্যই ওড়নার ওপর জড়িয়ে নিতে হবে। যাতে মুখমণ্ডল আড়াল হয়ে যায়। শুধু বাড়িতে চাদর খুলে রাখা যাবে। অবশ্য বৃদ্ধা মহিলারা এ নির্দেশের বাইরে। যারা বৃদ্ধা তারা অপরিচিত পুরুষের সামনে লম্বা চাদর ছাড়া যেতে পারে কিন্তু অবশ্যই ওড়না দিয়ে মাথা ভালোভাবে ঢেকে নিতে হবে, যেন চুল দেখা না যায়।[১১৮]

প্রয়োজনে কোনো মহিলা অপরিচিত কোনো পুরুষের সাথে কথা বলবে এটিকে আলী (রা) অন্যায় মনে করতেন না। কিন্তু মহিলারা পুরুষদের মজলিসে কিংবা মার্কেট বা শপিং সেন্টারে গিয়ে পুরুষদের মাঝে চলাফেরা করবে এটি তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর শাসনামলে একবার জনতাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন– 'আমি সংবাদ পেলাম তোমাদের স্ত্রীরা বাজারে গিয়ে হাবশীদের মাঝে চলাফেরা করে, তোমাদের কি আত্মমর্যাদাবোধ নেই? যার আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে যায় তার মধ্যে আর ভালো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।'[১১৯]

---

১১৭. ফিকহী বিশ্বকোষ-২, উমার (রা)-এর ইজতিহাদ ও অভিমত, ড. রাওয়াস কালাজী, 'হিজাব' শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

১১৮. ফিকহী বিশ্বকোষ-৫, ইবনু মাসউদ (রা)-এর ইজতিহাদ ও অভিমত, ড. রাওয়াস কালা'জী, 'হিজাব' শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

১১৯. ফিকহী বিশ্বকোষ-৪, আলী (রা) এর ইজতিহাদ ও অভিমতসমূহ। ড. রাওয়াস কালা'জী, 'হিজাব' শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

মহিলাদের তাওয়াফ সংক্রান্ত ইবনু জুরাইজ (রহ)-এর এক প্রশ্নের জবাবে আতা (রহ) বলেছেন– পুরুষগণ মহিলাদের সাথে মিলেমিশে তাওয়াফ করতেন না। আয়িশা (রা) পুরুষদের পাশ কাটিয়ে তাওয়াফ করতেন। তাদের সাথে মিশে যেতেন না। এক মহিলা আয়িশা (রা) কে বললেন, উম্মুল মুমিনীন! চলুন না আমরা তাওয়াফ করে আসি। তিনি বললেন– 'মনে চাইলে তুমি যাও।' তিনি যেতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা রাতের বেলা নিকাব ঝুলিয়ে বের হয়ে সম্পূর্ণ না মিশে পুরুষদের পাশাপাশি থেকে তাওয়াফ করতেন। উম্মুল মুমিনীনগণ বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতে চাইলে সকল পুরুষ বের করে না দেয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন।[১২০]

হিজাব প্রগতির অন্তরায় নয়

ইসলাম বিরোধী ও বিদ্বেষীরা খুব দরাজ গলায় বলে বেড়ায়, ইসলামের হিজাব প্রথা মুসলিম মহিলাদের পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের কারণে জাতীয় উন্নয়ন ও প্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই জাতীয় উন্নতি ও প্রগতি চাইলে মুসলিম মহিলাদের হিজাব বা পর্দা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে।

মুক্ত বিহঙ্গের মত বন্ধু-বান্ধবীর হাত ধরে ঘুরে বেড়ানো, ফ্যাশনের নামে বেলেল্লাপনা, নাইট ক্লাবে গিয়ে ভিন পুরুষের সাথে রাত কাটানো, অফিসের বসকে নিয়ে কিংবা অফিসের পি/এ বা পি/এসকে নিয়ে প্লেজার ট্যুরে যাওয়া– এগুলো যদি প্রগতি হয় তাহলে ইসলাম তথাকথিত এ প্রগতির ঘোর বিরোধী। আর যদি প্রগতি বলতে নারী-পুরুষ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেয়া বুঝায়, আদর্শ পরিবার, আদর্শ সমাজ ও জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্র বুঝায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা বুঝায় তাহলে ইসলাম সেই প্রগতির বিরোধী তো নয়ই বরং ইসলাম-ই তার প্রবক্তা। ইসলাম সমাজ সংসার ত্যাগ করে সন্যাসব্রত গ্রহণকে যেমন নিন্দা করে তেমনি কোনো কাজকর্ম না করে দ্বারে দ্বারে হাত পেতে ঘুরে বেড়ানোকেও ঘৃণা করে। তাই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শিক্ষা হচ্ছে– একজন মুসলিম বা একজন মুমিনের সাধনা হবে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ লাভের প্রচেষ্টা চালানো। এই নীতিকে ধারণ করেই মুসলিমগণ একদিন গোটা পৃথিবীর শিক্ষকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১২০. সহীহ্ আল বুখারী, পরিচ্ছেদ নম্বর-১০২৪ (ই.ফা), হজ্জ অধ্যায়।

www.amarboi.org

ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের আদর্শের আলোকছটা। তখন নারীরাও পেছনে ছিলেন না। হিজাবও তারা পরিত্যাগ করেননি। এখনও যদি আমরা সেরকম একটি সোনালী সমাজ ও রাষ্ট্র চাই হিজাব মেনেই তা পাওয়া সম্ভব। একটি জাতি ও একটি সভ্যতার আতুর ঘর হচ্ছে সেই জাতির প্রতিটি পরিবার। এজন্যই নেপোলিয়ান বোনাপার্টি বলেছিলেন– 'তোমরা আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো।' নেপোলিয়ান বুঝতে পেরেছিলেন, পরিবারে একজন মায়ের গুরুত্ব কতটুকু। প্রত্যেকটি পরিবার হচ্ছে– সমাজ নামক অবকাঠামোর এক একটি খুঁটি। তাই পারিবারিক বন্ধন যাতে অটুট রাখা যায়, পারিবারিক স্থিতিশীলতা যাতে বজায় থাকে সেজন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُلَةٌ عَنْهُمْ۔

"নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান সন্ততির তত্ত্বাবধায়ক। সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১২১]

এ হাদীসের বক্তব্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় নারীর আসল কর্মস্থল তার পরিবার, তার বাড়ি। কারণ যাকে তত্ত্বাবধায়ক বানানো হয়েছে তিনি যদি তার কর্মস্থল থেকে অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তিনি পালন করবেন কি করে? আর যদি পালন করতে না পারেন তাহলে আদালতে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। এ হচ্ছে একটি দিক। আরেকটি দিক হচ্ছে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে হতে হবে শিক্ষিত। ইসলাম প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর জন্য শিক্ষাকে ফরয (বাধ্যতামূলক) করেছে।[১২২] শিক্ষা বলতে এখানে দীনি শিক্ষা ও পার্থিব শিক্ষা উভয়কেই বুঝিয়েছে। একজন নারীর নেতৃত্বে একটি পরিবারের আদর্শ কাঠামো গড়ে তুলতে যতটুকু শিক্ষা প্রয়োজন ততটুকু শিক্ষা তাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অফিস আদালতে গিয়ে পুরুষদের পাশাপাশি বসে চাকুরী করা ছাড়াও সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে একজন নারী স্বচ্ছন্দে অংশগ্রহণ করতে পারেন। মিশরে জাতীয় উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের পরামর্শ আমাদের সেই দিক নির্দেশনাই দেয়। তিনি বলেছেন,

---

১২১. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৬৬৫৩।

১২২. সহীহ্ মুসলিম দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

– প্রতিটি এলাকা ও মহল্লায় বড়ো বড়ো শিশু পরিচর্যা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে শিশুদের উন্নত মানের প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা। (এ কাজে মহিলাদের নিয়োগ করা)।

– নারীর গৃহভিত্তিক পেশাগত কাজের উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।

– গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করেও সেবামূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। যেমন প্রস্তুত বা আধা প্রস্তুত খাবার তৈরি করা কিংবা যে পরিবারে একটি মাত্র শিশু আছে সেই পরিবারে সীমিত সংখ্যক শিশু নিয়ে পরিচর্যা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা।[১২৩]

মোটকথা নারী গৃহ কেন্দ্রিক থেকেও সামাজিক উন্নয়ন ও সভ্যতার বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন সেকথা শুধু মৌখিক দাবী নয় বরং ঐতিহাসিক সত্য। নবীপত্নীগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সমস্যা সংকুল মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করেছেন। নবীগৃহ ছিলো সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থল। এসব কাজে নবীবেগমদের অবদান ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। আজও পুরুষরা দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ কোনো অবদান রাখলে সাক্ষাৎকারে অকপটে স্বীকার করেন সেই অবদানের নেপথ্যে তার স্ত্রীরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। এসব ঐতিহাসিক সত্য সামনে রাখলে বুঝা যায় যারা বলতে চান 'হিজাব প্রগতির অন্তরায়' তাদের উদ্দেশ্য মহৎ নয়।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ

ইসলাম মানুষ হিসেবে একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মধ্যে পার্থক্য করে না। একজন মানুষের ওপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে দায়ভার অর্পণ করেছেন তা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সমান। যেমন নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, দীনি শিক্ষা, আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্য ইত্যাদি। এসব বিষয়ে উভয়কে সমানভাবে দায়ী করা হবে এবং উভয়কে সমান বিনিময় দেয়া হবে। কিন্তু লিঙ্গ ও শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে পুরুষ ও মহিলাকে

১২৩. দেখুন, রাসূল (সা)-এর যুগে নারী স্বাধীনতা, আবদুল হালিম আবু শুক্কাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৭। বি.আই.আই টি কর্তৃক প্রকাশিত।

www.amarboi.org

পৃথক করা হয়েছে এবং সেই কারণে তাদের কর্মক্ষেত্রও পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। পুরুষরা বাইরে কাজকর্ম করবে এবং স্ত্রী সন্তানদের ভরণ পোষণ ও অভিভাবকত্ব করবে। আর মহিলারা বাড়িতে কাজকর্ম করবে এবং সন্তান ও স্বামীর সংসার সামলাবে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য এগুলোই তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র। এদের কাউকে দিয়ে এর ব্যতিক্রম কিছু করানোর চেষ্টা করা নিঃসন্দেহে তাদের ওপর যুল্‌ম (অত্যাচার) করা।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যার অর্থনৈতিক অধিকার নেই তাকে তো আর স্বাধীন বলা যায় না। ইসলাম যদি নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে না দেয় তাহলে তাকে স্বাধীন বলা যায় কিভাবে? এর উত্তরে বলা যায় ইসলাম নারীকে পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে। সে বিভিন্নভাবে অর্থ-সম্পদের মালিক হতে পারে এবং সেই অর্থ-সম্পদ একান্তভাবেই তার। স্বামীর সংসারে সেই সম্পদ খরচ করতে সে বাধ্য নয়। যদি স্বামী সন্তানের ভালোবাসায় সেই সম্পদ থেকে খরচ করে সেটি তার বদান্যতা। এজন্য ইসলাম তাকে সর্বোত্তম দানের বিনিময় দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। একজন নারীর আয়ের উৎসগুলো নিম্নরূপ –

১. পিতার সম্পদে উত্তরাধিকার,

২, স্বামী প্রদত্ত দেন মোহর,

৩. স্বামীর মৃত্যুর পর তার সম্পদে উত্তরাধিকার,

৪. সন্তানের মৃত্যুতে সন্তানের সম্পদে উত্তরাধিকার,

৫. উইল (বা ওসিয়াত) সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ,

৬. হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ। হস্তান্তর বলতে দান, বিক্রি, রেহেন, ভাড়া প্রভৃতি বুঝায়।

এসব সূত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ একজন নারী যদি কারও তত্ত্বাবধানে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে তাহলে তাকে আর কারও কাছে হাত পেতে বেড়াতে হয় না এবং সে আত্মমর্যাদা নিয়েই সমাজে বসবাস করতে পারে। এমনকি নিজের সম্পদ থেকে দান সাদাকাও করতে পারে।

যেহেতু স্ত্রী ও সন্তানের ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব স্বামীর তাই যে মহিলার স্বামী রয়েছে তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু অধুনা আমরা পাশ্চাত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভোগের দিকে ছুটে চলছি। অথচ ইসলাম শিক্ষা দেয় পার্থিব জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত সময়, এখানে ভোগের পরিবেশ

www.amarboi.org

নেই। তাই ভোগের পরিবর্তে ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। আখিরাত বা পরকালিন জীবনের কথা আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। তাই পার্থিব আরাম আয়েশ ও ভোগ সম্ভোগের দিকে মনোনিবেশ করেছি। দেখা যাচ্ছে স্বামী চাকুরী করছেন তার আয়ে সংসারও মোটামুটি চলে যাচ্ছে তবু স্ত্রী আরেকটু বেশি সম্পদের জন্য চাকুরী করছেন। সচ্ছলতাও হয়তো ফিরে আসছে কিন্তু নষ্ট হচ্ছে আদরের সন্তান। তারা কাজের বুয়ার কাছে তাদের মত করে মানুষ হচ্ছে কিংবা একাকিত্বে বড়ো হওয়ার কারণে সন্তান তার মেধা হারিয়ে ফেলছে। আবার দেখা যায় যে সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য চাকুরীতে যাওয়া সেই সাধের সংসারটিই একদিন ভেঙ্গে যাচ্ছে। ইসলাম এ অবস্থাকে কখনও সমর্থন করে না।

ইসলাম কেবল তাদেরই চাকুরী করার অনুমতি দেয় যারা অসহায়, সম্বলহীন, উত্তরাধিকার সূত্রেই হোক কিংবা অন্য কোনো সূত্রের মাধ্যমে যে মহিলা, অর্থ সম্পদের মালিক হতে পারেনি। তার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য সচ্ছল কোনো অভিভাবকও নেই। কিংবা ইয়াতিম ছেলেমেয়ে নিয়ে অসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, এরূপ দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির শিকার হলে ইসলাম তাকে চাকুরীর অনুমতি দিয়েছে। তবে সেখানেও কিছু শর্তারোপ করা হয়েছে যেমন–

১. ইসলামের মৌল নীতিমালা ও নৈতিকতার সাথে সেই চাকুরীর সামঞ্জস্য ও সংগতি থাকতে হবে। যেমন মা ও স্ত্রী হিসেবে তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় চাকুরীটা কোনোক্রমেই এমন হবে না।

২. চাকুরীরত মহিলা তার পুরুষ কর্মীদের সাথে মেলামেশা এবং শরীরের নিষিদ্ধ স্থানগুলো তাদের সামনে প্রকাশ করতে পারবে না।

৩. একই কক্ষে এক বা একাধিক পুরুষের সাথে বসে কাজ করা যাবে না।*

কখনো কখনো মহিলাদের অর্থোপার্জন জরুরী হয়ে পড়ে। সেজন্য এমন কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন যেখানে পরিকল্পিতভাবে মহিলাদের কর্মসংস্থান করা যেতে পারে, যেমন- হাসপাতাল, শিশুদের স্কুল, মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হস্তশিল্প ইত্যাদি।

মোটকথা একান্ত প্রয়োজনে মহিলারা বাইরে বের হতে পারবেন। চাকুরী, লেনদেন, কেনাকাটাসহ হাটবাজার সবই করতে পারবেন। তবে কোনো অবস্থাতেই হিজাবের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন না।

---

* চাকুরীর শর্তগুলো নেয়া হয়েছে– ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী– ড. মুসতফা আস সিবায়ী. পৃ-১১০, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ প্রকাশ ২০০৭ ঈসায়ী।

www.amarboi.org

হিজাব এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে পুরুষের ভূমিকা

নারী-পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত হয় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। তাই কোনো কল্যাণমূলক কাজ ততক্ষণ পুরোপুরি ফলপ্রসূ হতে পারে না যতক্ষণ নারী-পুরুষ একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে না আসে। হিজাবও তেমনি ধরনের একটি কল্যাণমূলক কাজ। আর এ কাজও পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই হিজাবকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে পুরুষেরও কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। নিচে তাদের সেই দায়িত্ব কর্তব্যগুলো আলোচনা করা হলো।

১. পুরুষরা তাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে ঃ

আল্লাহ বলেন–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ

'মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে। এটি তাদের জন্য বিশুদ্ধ নীতি। তারা যা কিছু করে আল্লাহ তা জানেন।'[১২৪]

২. গাইরি মাহরাম মহিলার কাছে কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাবে ঃ আল্লাহ্ বলেন–

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ـ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ـ

'আর যখন তাদের কাছে কিছু চাইতে হয় তা পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটি তাদের ও তোমাদের মনের পবিত্রতম পদ্ধতি।'[১২৫]

৩. বাড়ির লোকদের সম্মতি না পেলে ও তাদের সালাম না দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা যাবে না ঃ

আল্লাহ্ বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ـ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ـ

১২৪. সূরা আন নূর, আয়াত-৩০।
১২৫. সূরা আল আহযাব, আয়াত-৫৩।

www.amarboi.org

'হে ঈমানদারগণ! নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারও ঘরে তাদের সম্মতি না নিয়ে ও সালাম না জানিয়ে প্রবেশ করো না। এটি তোমাদের জন্য উত্তম বিধান। সম্ভবত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।[১২৬]

৪. গৃহবাসীদের পক্ষ থেকে যদি বলা হয়– 'এখন চলে যান' চলে আসতে হবে ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمْ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ـ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ـ

'আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় 'এখন যান' তাহলে ফিরে যাবে। এটি তোমাদের জন্য পবিত্র নীতি। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।'[১২৭]

৫. কারও ঘরে উঁকি দেয়া যাবে না ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

وَلَا يَنْظُرُ فِىْ قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ اَنْ يَّسْتَاْذِنَ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ ـ

'কেউ কারও ঘরে প্রবেশের অনুমতি নেয়ার আগে যেন উঁকি না দেয়। যে এমন করলো, সে যেন ঢুকেই পড়লো।'[১২৮]

অন্য হাদীসে আছে–

لَوْ اَنَّ امْرَأً اَطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ ضِلْعٌ ـ

'কেউ যদি তোমার অনুমতি ছাড়াই তোমার ঘরে উঁকি দেয় আর তুমি পাথর মেরে তার চোখ ফুটো করে দাও। তাতে কোনো দোষ হবে না।'[১২৯]

৬. কারও দরোজা জানালার মুখোমুখি দাঁড়ানো যাবে না ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتٰى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلٰكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْاَيْمَنِ اَوِ الْاَيْسَرَ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ـ

১২৬. সূরা আন নূর। আয়াত-২৭।

১২৭. সূরা আন নূর, আয়াত-২৮।

১২৮. সুনানু আবী দাউদ, জামি আততিরমিযী, সুনানু ইবনু মাজাহ্।

১২৯. সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, মুসনাদ আহমাদ।

www.amarboi.org

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কারও বাড়ি বা ঘরের দরোজায় এসে দাঁড়াতেন। তখন দরোজার দিকে মুখ করে না দাঁড়িয়ে ডানদিকে কিংবা বাম দিকে সরে দাঁড়াতেন এবং বলতেন– 'আসসালামু আলাইকুম'।[১৩০]

৭. গাইর মাহরাম কোনো মহিলার সাথে একাকী সাক্ষাৎ করা যাবে না ঃ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ ـ

উকবা ইবনু আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– '(গাইর মাহরাম) মহিলাদের কাছে একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক।'[১৩১]

ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلَّا مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ ـ

'মাহ্‌রামের উপস্থিতি ছাড়া কোনো মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করবে না।'[১৩২]

শেষ কথা

ওপরের আলোচনা থেকে আশা করি পরিষ্কার হয়ে গেছে, হিজাব ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। একটি ইবাদাত। একজন মুমিন পুরুষ কিংবা একজন মুমিন নারী একে কোনোভাবেই অবজ্ঞা করতে পারেন না। এমনকি শৈথিল্যও প্রদর্শন করতে পারেন না। যাঁরা নারীদের মুখ খোলা রাখার প্রবক্তা তাঁরা তো মাত্র ৮/১০টি হাদীস দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মুখ ঢেকে রাখার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেসব হাদীস রয়েছে তার সংখ্যা প্রায় ৭০টি।[১৩৩]

সাহাবীদের মধ্যে অনেক বিষয়ে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন কিন্তু যেসব বিষয়ে তারা দ্বিমত পোষণ করেছেন তাদের বিপরীত মত পোষণকারীদের সংখ্যা

---

১৩০. সুনানু আবী দাউদ।

১৩১. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৪৮৫৬ (ই.ফা)।

১৩২. সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস-৪৮৫৭ (ই.ফা)।

১৩৩. মাআরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মদ শফী, ৪র্থ খণ্ড।

www.amarboi.org

তাদের চেয়ে অনেক বেশি। তাই বলা যায় অধিকাংশ সাহাবী ও সলফে সালেহীন যে মত পোষণ করতেন সেটিই ইসলামের মূল ধারা। দুচারজন যারা কোনো কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন সেটি ইসলামের ক্ষীণ ধারা। ক্ষীণ ধারা কখনও মূলধারার চেয়ে প্রাধান্য পেতে পারে না। সর্বাবস্থায় মূলধারার অনুসরণ করতে হবে উসমান (রা) এর এটিই হচ্ছে ওসিয়াত।[১৩৪]

যে নিকাবের ব্যাপারে তাঁরা বিতর্ক করার চেষ্টা করেন সেই নিকাবের প্রচলন জাহিলী যুগেও ছিলো। জাহিলী যুগের অনেক কবির কবিতা সে কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে।[১৩৫] সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলারা নিকাব ব্যবহার করতেন। যাঁরা নিকাব ব্যবহার করতেন না সেই সব মহিলাকে সমাজে সম্ভ্রান্ত হিসেবে গণ্য করা হতো না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাহিলী যুগের অনেক ভালো কাজ এবং রীতিকে অনুমোদন করেছেন, যা পরবর্তীতে ইসলামী রীতি ও নীতিমালা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিকাব তার অন্যতম।

আরেকটি কথা হচ্ছে নিকাবের প্রচলন ছিলো বিধায় হজ্জের ইহ্‌রামে মহিলাদের নিকাব ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি প্রচলন না থাকতো তাহলে তো আর নিষেধ করার প্রশ্নই ওঠতো না।

'ফিতনার (বিপর্যয়ের) আশঙ্কা থাকলে মুখ খোলা রাখা যাবে না' একথার সাথে আইম্মায়ে মুতাকাদ্দিমীন (পূর্ববর্তী যুগের ইমামগণ) এবং আইম্মায়ে মুতাআখখিরীন (পরবর্তী যুগের ইমামগণ) একমত। যারা মুখ খোলা রাখার পক্ষে কথা বলেছেন, তারাও শর্ত দিয়েছেন– 'যদি ফিতনা সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে'। বর্তমানে মুখ খোলা রাখার কারণে প্রথমে বখাটেরা বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে। রাজি না হলে এসিড নিক্ষেপ করছে কিংবা অপহরণ করছে। কেউ কেউ ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মেয়েরা তাদের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নিচ্ছে। এরপরও কি মুখমণ্ডল খোলা রাখার যৌক্তিকতা অবশিষ্ট থাকে?

আমরা মনে করি, ফিতনার আশংকা আছে বলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হিজাব বিধান নাযিল করে ফিতনা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ্ আমাদেরকে হিজাবের তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করে সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

---

১৩৪. পুরুষ ও মহিলাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র, এ.কে.এম নাজির আহমদ, পৃ-৬২,৬৩,৬৪ দ্রষ্টব্য।

১৩৫. আবী তামাম, হামাসা, পৃ. ২৪১। লিসানুল আরব, 'বোরকা' শব্দ। দেওয়ান হাতিয়া, পৃ. ১১।

www.amarboi.org

তথ্যসূত্র

১. আল মাওরিদ (এ্যারাবিক ইংলিশ)- ড. রুহী বালবাকী. দারুল ইল্‌ম, বৈরত ১১তম সংস্করণ, ১৯৯৯ ঈসায়ী।

২. এ্যারাবিক ইংলিশ ডিকশনারী- জর্জ মিল্টন কাউন, স্পোকেন ল্যাংগুয়েজ সার্ভিস, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬।

৩. আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান- ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান। রিয়াদ প্রকাশনী। ২য় সংস্করণ ২০০৫ ঈসায়ী।

৪. ফার্সী বাংলা ইংরেজী অভিধান, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা। প্রকাশকাল-মার্চ ১৯৯৮ ইং।

৫. আল কুরআনের অভিধান, বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার ঢাকা, ২য় সংস্করণ, প্রকাশ কাল-২০০৫ ঈসায়ী।

৬. তরজমায়ে কুরআন মাজীদ, ফালাহ্-ই-আম ট্রাস্ট, ঢাকা-১৯৮২ ইং।

৭. আল কুরআনুল কারীম (বাংলা), বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত তারিখ বিহীন।

৮. কুরআনুল কারীম (উর্দু)- বাদশাহ্ ফাহ্‌দ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত, তারিখ বিহীন।

৯. রাওয়ায়িউল বায়ান তাফসীরু আয়াতুল আহকাম- মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী, মাকতাবাতুল গাযালী, দামেস্ক, সিরিয়া, ৩য় মুদ্রণ-১৯৮০।

১০. আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আল কুরতুবী, দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ্, বৈরুত। ১৯৮৮ ঈসায়ী।

১১. ফী যিলালিল কুরআন- সাইয়িদ কুতুব, দারুল্ শুরুক, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৯ ইসায়ী।

১২. আল মুহাররুল ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল আযীয-তাফসীর ইবনু আতিয়্যা- মুহাম্মদ আবদুল হক ইবনু আতিয়্যা আল আন্দালুসী, কাতার থেকে প্রকাশিত, তারিখ বিহীন।

১৩. মুখতাসার তাফসীর ইবনু কাছীর- হাফিয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাছীর দামিস্কী; দারুল কুরআন, বৈরত, ১৯৮১ ঈসায়ী।

১৪. সাফাওয়াতুত্ তাফাসীর আস সাইয়্যেদ হাসান আব্বাস, তারিখ ও প্রকাশনার নামবিহীন।

১৫. তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন-শাইখুত্ তাফসীর ও হাদীস- হাফিয মুহাম্মদ ইদরীস কান্দালভী, মাকতাবাতুল উছমানিয়্যা, লাহোর-১৯৮২।

১৬. তাফসীর আশরাফী- এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

১৭. মা'আরিফুল কুরআন- মুফতি মুহাম্মদ শফী, করাচী থেকে প্রকাশিত, ১৯৮৮ ইং।

১৮. আদ্‌ওয়াউল বায়ান ফী ঈদাহ্ আল কুরআন বিল কুরআন- মুহাম্মদ আল আমীন ইবনু মুহাম্মদ আল মুখতার আল জাকানী আল শানকীতী, আলামুল কুতুব, বৈরুত। ১৯৮৩ ঈসায়ী।

১৯. তাফহীমুল কুরআন- সাইয়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, লাহোর থেকে প্রকাশিত, ৭ম প্রকাশ, ১৯৭৪ ঈসায়ী।

www.amarboi.org

২০. তাফসীর আল মাযহারী– মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ আল উছমানী পানিপথী, মাকতাবাতু রাশীদিয়া, করাচী, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।

২১. তাফসীর ফাতহুল কাদীর– মুহাম্মদ ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মদ আশ শাওকানী, দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৯৮১ ঈসায়ী।

২২. আহকামুল কুরআন, আবু বকর আহমাদ ইবনু আলী আর রাজী আল জাসসাস, দারুল কিতাব, বৈরুত, লেবানন।

২৩. আল মুফাসসাল আহকামুল মারআতি ওয়া বাইতিল মুসলিম– ড. আবদুল কারীম যায়দান। আর রাসালা পাবলিশিং হাউয, বৈরুত, লেবানন, তৃতীয় মুদ্রন, ১৯৯৭।

২৪. তাফসীর রুহুল মাআনী–তাফসীর আল কুরআনুল আযীম ওয়াস সাবউল মাছানী– আল্লামা আলুসী আল বাগদাদী, বৈরত, ১৯৮৫ ঈসায়ী।

২৫. তাফসীর কাবীর– মাফাতিহুল গায়ব– ইমাম ফখরুদ্দীন আল রাযী, বৈরত, লেবানন থেকে প্রকাশিত।

২৬. তাফসীর আল বায়যাভী, আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত্ তাভীল– আল্লামা নাসিরুদ্দীন আবুল খায়ের আবদুল্লাহ ইবনু উমার আল বায়যাভী, বৈরত থেকে প্রকাশিত, তারিখ বিহীন।

২৭. তাফসীর আল কাশ্‌শাফ– আল কাশ্‌শাফ আন হাকায়িকিত তানযীল– মুহাম্মদ ইবনু উমার আল যামাখশরী, বৈরত, লেবানন, তারিখ বিহীন।

২৮. মাজমুউন ফাতওয়া– ইমাম ইবনু তাইমিয়া, সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত, তারিখ বিহীন।

২৯. বাজলুল মাজহুদ ফী হাল্লে আবী দাউদ– আল্লামা মুহাম্মদ যাকারিয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া আল কান্দালাভী, দারুল কুতুব, তারিখ বিহীন।

৩০. আল জামিউল মুসনাদুস সাহীহ্ আল মুখতাসার মিন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি– সহীহ্ আল বুখারী, আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী আল জু'ফী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ-২০০৫।

৩১. আস সাহীহাহ্– সহীহ্ আল মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুরাইশী আন নিশাপুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯২ ঈসায়ী।

৩২. আল জামিউ আল মুখতাসারু মিনাস সুনানী আন রাসূলিল্লাহি ওয়া মাআরিফাতু আস সাহীহি ওয়াল মা'লূলী ওয়ামা আলাইহিল আমাল– জামি আত তিরমিযি– আবু দাউদ মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত তিরমিযি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, ২০০০ ঈসায়ী, প্রথম প্রকাশ।

৩৩. আল মুজতাবা আস সুনান আস সুগরা– সুনানু নাসাঈ,– আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনু শুআইব আন নাসাঈ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, ২০০০ ঈসায়ী, প্রথম প্রকাশ।

৩৪. সুনানু আবী দাঈদ– আবু দাঈদ সুলাইমান ইবনুল আশআছ আস সিজিস্তানী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-১৯৯০।

৩৫. কিতাবুস সুনান– সুনানু ইবনু মাজা– আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ্ আল কাযভিনী। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০০ ঈসায়ী।

www.amarboi.org

৩৬. হামাসা-আবু তামাম, বাংলা সংস্করণ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, প্রকাশকাল-১৯৮১ ঈসায়ী।

৩৭. পর্দার হাকীকত– মুহাম্মদ খলিলুল রহমান মুমিন, ৩য় সংস্করণ, ২০০২ ঈসায়ী।

৩৮. রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা– আবদুল হালীম আবু শুককাহ্ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বি.আই.আই.টি) ঢাকা। ১৯৮৪ থেকে ২০০৬ ঈসায়ী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন খণ্ড।

৩৯. পর্দা ও ইসলাম– সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ৮ম, প্রকাশকাল মে-২০০৭।

৪০. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী– ড. মুসতফা আস সিবায়ী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ, সেপ্টেম্বর-২০০৭।

৪১. পুরুষ ও মহিলাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র– এ.কে.এম নাজির আহমদ, আন নূর প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০২ ঈসায়ী।

৪২. পর্দার আসল রূপ– এ. কে. এম. নাজির আহমদ, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৮ ঈসায়ী, ঢাকা।

৪৩. ইসলামের দৃষ্টিতে নিকাব– মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, জুলাই-১৯৯৭ ঈসায়ী।

৪৪. দারসে তিরমিযি– বিচারপতি মুফতি তকী উছমানী, অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা নো'মান আহমদ, শিবলী প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ-২০০৬ ঈসায়ী।

৪৫. শরঈ পর্দা– মাওলানা আশেক ইলাহী, করাচী থেকে প্রকাশিত।

৪৬. ফিকহী বিশ্বকোষ–১,২,৩,৪ও ৫ খণ্ড, ড. রাওয়াস কালা'জী।

– o –

www.amarboi.org

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN 984-843-036-8